স্বপ্ন
কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'স্বপ্ন' বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ভাষা শহীদ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মানুষ ঘুমিয়ে এবং না-ঘুমিয়েও যে স্বপ্ন দেখে, তার রয়েছে নানা দিক– সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, শিল্পসাহিত্যগত এবং স্বাস্থ্যগত। প্রাচীনকাল থেকেই তাই স্বপ্ন ব্যাখ্যার নানা প্রচলন ঘটে, 'খাবনামা', ইত্যাদি রচিত হয়। পরবর্তী সময়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেচেনফ, পাভলভ প্রমুখ আবার স্বপ্নের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এসে যায় যন্ত্রনির্ভর স্বপ্নসমীক্ষার যুগ; ইইজি, আর-ই-এম, ইত্যাদি যন্ত্র, ধারণা। তবে এই স-ব তত্ত্ব, আবিষ্কার, ইত্যাদি অতিক্রম করে মানুষ আজও স্বপ্ন দেখে চলেছে। আর এর চেয়ে বড় ও ভালো আর কিছু নেই। স্বপ্ন সম্পর্কে এই নানামুখী ব্যাখ্যা-তত্ত্ব ও আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্বপ্ন' বইটি তাই পাঠকের নানা ধরনের আগ্রহ মেটাবে।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ও জন্মতারিখ : বরিশাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪। স্থায়ী ঠিকানা : ৫৩, পুরানা পল্টন, ফ্ল্যাট–আই/ওয়ান, ঢাকা–১০০০। বর্তমান ঠিকানা : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। শিক্ষা : স্নাতকোত্তর (ইংরেজি সাহিত্য) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। তাঁর লেখা অন্যান্য বই : কাব্যগ্রন্থ : কাঙাল দীর্ঘকাল (১৯৮৫) ; দগ্ধ ধুলিকণা (১৯৮৬) ; পৃথিবীর গৃহকোণ (১৯৮৮) ; উত্থানের মন্ত্র নেই (১৯৮৯) ; হেসে ওঠে অশ্রুজল (১৯৯৮) ; প্রবন্ধ : সাম্রাজ্যবাদ : অন্য উন্মোচন (১৯৮৬); জীবনীগ্রন্থ : রূপকথার রাজা (হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের জীবনী, ১৯৮৭) ; আহমেদুর রহমান (১৯৯০) ; অনুবাদ : পুঁজিবাদ ও পরিবেশবিনাশ (১৯৮৮), ইউরোপের চিত্রকলা (১৯৯৫) ; Quamrul Hassan (১৯৯৫) ; সম্পাদনা : তৃতীয় বিশ্বের কবিতা (১৯৮৯, যুগ্মভাবে) ; ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা (১৯৯৩, যুগ্মভাবে) ; বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্মসাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট (১৯৯৯, যুগ্মভাবে)।

ভাষা-শহীদ

গ্রন্থমালা
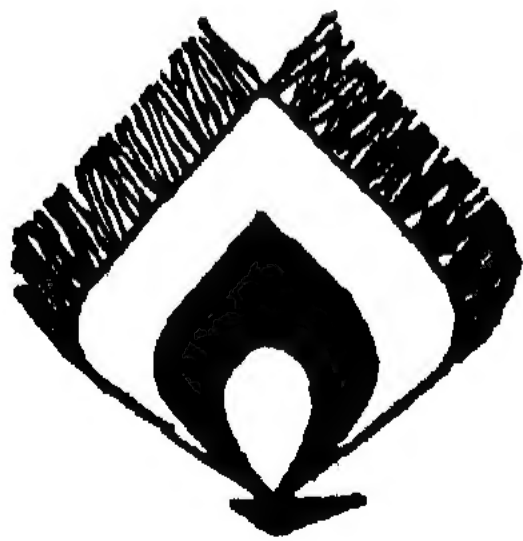
স্বপ্ন

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়
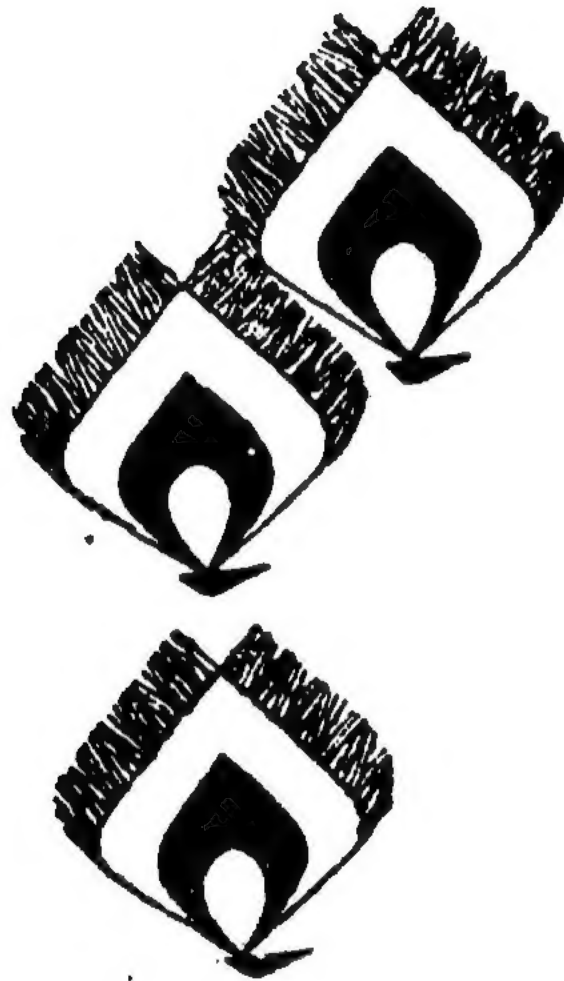
বাংলা একাডেমী ঢাকা

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

বাএ ৪০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৫ পৌষ ১৩৯২/২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশক : পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০৭/ জানুয়ারি ২০০১। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র।

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

SAPNO [Dream] by Kajal Banarjee. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh : First Reprint : January 2001. Price : Taka 60.00 Only.

ISBN 984-07-4098-9

দিদি, শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা চার হাজারের অধিক। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষ্যে ১৯৯১ থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'স্বপ্ন' বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মানুষ ঘুমিয়ে এবং না- ঘুমিয়েও যে স্বপ্ন দেখে, তার রয়েছে নানা দিক— সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক; শিল্প-সাহিত্যগত এবং স্বাস্থ্যগত। প্রাচীনকাল থেকেই তাই স্বপ্ন ব্যাখ্যার নানা প্রচলন ঘটে, 'খাবনামা', ইত্যাদি রচিত হয়। পরবর্তী সময়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেচেনফ, পাভলভ প্রমুখ আবার স্বপ্নের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। গ্রন্থটিতে স্বপ্ন সম্পর্কে এই নানামুখী ব্যাখ্যা-তত্ত্ব ও আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থ আগের মতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এ আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিকটুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা— জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

সবাই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কেন? স্বপ্ন সভ্যতাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে? স্বপ্ন কি সত্য? স্বপ্ন কি মিথ্যা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচিপত্র

স্বপ্ন ও আধ্যাত্মিকতা : সমাজতত্ত্বে, ইতিহাসে

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

স্বপ্ন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুজ্জনকে জাগিয়ে রেখেছিল

আমার পুরানো চাঁদ

পাপ্পাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই স্বপ্নচ্ছায়ানর ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিল এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না

কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিল আমায় পুরানো চাঁদ :

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন-ব্যাপারটিকে নিয়ে মানুষের ভাবা-লেখা-বলার কোনো শেষ নেই। তারও আগে বলতে হয় যে, মানুষ গড়পরতা জীবনের ৩৩% ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটায়, যার আবার একটি নির্দিষ্ট অংশ কাটায়-সে স্বপ্ন দেখে (এডওয়ার্ড জে মুরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সের মানুষের ঘুমের পরিমাণের একটি আনুমানিক হিসাব দেখিয়েছেন। চার বছর বয়সের পর থেকে মানুষের স্বপ্ন দেখার সময় কমে এসে গোটা ঘুম-সময়ের প্রায় ২০% ভাগে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ বয়সে সে পরিমাণ আরও একটু কমে যায়। অন্য মতে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-

মানুষের ক্ষেত্রে স্বপ্ন মোট ঘুমের ২৫% ভাগ জুড়ে থাকে। ষাট বছর বয়সের দিকে এসে অবশ্য এই পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে, অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে এই পরিমাণ কমার প্রমাণ পাওয়া যায়।) দিবাস্বপ্ন ব্যাপারটিও আমরা সকলেই জানি। আমাদের অনেক কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে আমরা নিজেরাই বলি স্বপ্ন, সে-সবের ব্যর্থতাকে বলি স্বপ্নভঙ্গ। ভয়াবহ কোনো কিছুকে দুঃস্বপ্নের সাথে তুলনা করি। এছাড়াও আমরা স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ থেকে শুরু করে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে লেখা কবিতা ইত্যাদি সম্পর্কেও জানি। অথচ তারপরও, স্বপ্ন এবং স্বপ্নসম্পর্কিত বিষয়াদি মানবজীবনে কত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান যে দখল করে আছে, সে সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশেরই কোনো সঠিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, মানব সভ্যতার তথা মানুষের জীবন-যাপন ও ধ্যান-ধারণার অগ্রগতিতে স্বপ্ন ব্যাপারটি একটি অসামান্য ভূমিকা রেখে এসেছে সেই শুরু থেকেই। ঘুম এবং স্বপ্ন—এই দুই মিলে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আদিম মানুষের বিস্ময়ের বোধকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতিতে ঘুম ছিল অত্যন্ত রহস্যজনক একটি ব্যাপার। এবং তাই মানুষের মনে প্রথমে যে-সকল কারণে অলৌকিক বিশ্বাসাদি জন্ম নেয়, বোধগম্য কারণেই ঘুম হয়ে দাঁড়ায় তার অন্যতম। ঘুমন্ত মানুষ ছিল মৃত মানুষের সাথেই তুলনীয়। কিন্তু, পূর্ণ মৃতও আবার তাকে ভাবা হতো না, ভাবা হতো যে ঘুমোলে মানুষের কিছু একটা হারিয়ে যায়। আর সাময়িকভাবে সেই যা হারিয়ে যায়, সে-সম্পর্কিত মানুষের প্রাথমিক কল্পনাই এক সময় গিয়ে আত্মার ধারণায় রূপ নেয়। এবং এই আত্মার ধারণার উদ্ভবে ঘুম এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে স্বপ্নও খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করেছিল। কি ভাবে?

স্বপ্নাবিষ্ট মানুষ দেখতো যে, যেখানে সে ঘুমিয়েছে, সেখান থেকে বহু দূরে কোথাও সে চলে গেছে। তার সহজ অর্থ ছিল, আত্মা-জাতীয় কিছু সেই ভ্রমণকর্মটি করেছে। পরে জাগ্রত সত্তার নিকট প্রদত্ত সেই ভ্রমণের এবং ভ্রমণলব্ধ দর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদির বিবরণকেই মনে করা হতো স্বপ্ন। এইভাবে আত্মার ধারণা তথ্য আধ্যাত্মিকতা গড়ে ওঠার পেছনে খুব বড় আকারে

ছিল ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্ন-দেখা। জে জি ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত *দ' গোল্ডেন বাউ* বইয়ে এই স্বপ্নচারী আত্মা সম্পর্কে আদিম মানুষের গভীর বিশ্বাসের অনেক কাহিনী বলেছেন। যেমন, ব্রাজিল কিংবা গায়ানার কোনো মানুষ গভীর নিদ্রা থেকে জেগে গিয়ে ভাবতো এবং বিশ্বাসও করতো যে, তার আত্মা নিশ্চিতই স্বপ্নে-দেখা কোনো কাজ করতে গিয়েছিল, তার শরীরটিই শুধু ছিল বিছানায়। ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ করে জাগানোকেও মানুষ খুবই ক্ষতিকর মনে করতো— —ঘুমন্ত মানুষের দেহ থেকে স্বপ্নযোগে আত্মার বেরিয়ে পড়ার ধারণাটিতে তথা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে স্বপ্নে বিশ্বাস এতোই প্রবল ছিল! ঘুমন্ত অবস্থাকে পর্যন্ত বিপজ্জনক মনে করা হতো, কারণ, যদি কোনো কারণে কথিতভাবে অনুপস্থিত আত্মা দেহ থেকে স্থায়ীভাবে নির্বাসিত হয়, মানুষটি মারা যাবে। একটি জার্মান বিশ্বাস ছিল এরূপ যে, আত্মা ঘুমন্ত মানুষের মুখ দিয়ে সাদা ইঁদুর কিংবা ছোট পাখির আকারে বের হয়ে পড়ে, এবং কোনো কারণে সেই পশু কিংবা পাখিটির ফিরে আসা বাধাপ্রাপ্ত হলে ঘুমন্ত ব্যক্তি মারা যাবে।

জে. জি. ফ্রেজার বলেছেন, এরূপ বিশ্বাসও রয়েছে, যে দুর্ঘটনাক্রমে কিংবা অন্য কোনো শারীরিক শক্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও আত্মা তার দেহে ফিরে আসতে ব্যর্থ হতে পারে। যখন কোনো ডায়াক (Dyak)পানিতে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তখন সে ভাবে যে, তার আত্মার ক্ষেত্রে বাস্তবেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, এবং সে যাদুকর আনিয়ে তার হাত–জাল দ্বারা সেই আত্মার সন্ধান করায় এবং সংগ্রহ করে নেয়। সাঁওতাল এক ব্যক্তি এমন গল্পও বলেছে যে, ঘুমিয়ে পড়ার পর তৃষ্ণার্ত বোধ করায় এক ব্যক্তির আত্মা একটি সরীসৃপের আকারে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং পানি পান করার জন্য একটি কলসীতে প্রবেশ করে। সে মুহূর্তেই কলসীর মালিক হঠাৎ করে কলসীটি ঢেকে ফেলে। ফলে আত্মাটি দেহে ফিরতে পারে নি, এবং লোকটি মারা যায়।... ... ইত্যাদি।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ করে জাগানো সম্পর্কে 'দ' গোল্ডেন বাউ'য়ে বর্ণিত একটি ঘটনা নিম্নরূপ : মাটাকু–তে জনৈক ফিজিয়ানের পা হঠাৎ করে কেউ মাড়িয়ে দেয়ায় সে ঘুম থেকে জেগে যায় এবং তখন শোনা যায় যে, সে

তার আত্মাকে ডাকছে, ফিরে-আসার প্রার্থনা জানাচ্ছে। ঠিক সে-মুহূর্তে সে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল যে সে রয়েছে দূরে, টোঙ্গায়, এবং হঠাৎ জেগে গিয়ে মাটাকু-তে তার দেহে ফিরে আসার প্রশ্নে সে খুব ভয় পেয়ে যায়। সাগর পেরিয়ে দ্রুত স্বদেশে ফিরে আসার জন্যে তার আত্মাকে ধাবিত করার প্রাক্কালে তার মুখে মৃত্যুর মেঘচ্ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল। যদি কোনো ধর্মযাজক তার ভয় দূর করতে কাছাকাছি না থাকতো, তবে নাকি লোকটি ভয়েই মারা যেত।

বাংলাদেশেও ব্যাপক জনজীবনে স্বপ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বাজারে 'খাবনামা' জাতীয় পুস্তকের প্রচুর বিক্রি এ-অঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন-বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

সর্বোপরি, একথা বলা চলে যে, আত্মা এবং আধ্যাত্মিক জীবনবোধের একাংশের উদ্ভবের বেলায় ঘুম ও স্বপ্নের মতো অত্যন্ত বাস্তব, লৌকিক ও ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতাই যে এক বৃহৎ ভূমিকা রেখেছিল, আদিম মানবগোষ্ঠীসমূহের লৌকিক (folk) বিশ্বাসাদির গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

প্রমাণ হয় যে, আদিম মানুষ আত্মার ক্রিয়া স্বপ্ন এবং বাস্তব ঘটনাকে সমান সত্য মনে করতো। যেমন, গ্রান চাকো (Gran Chaco)-র আদিম ভারতীয়রা নানা অভিযানের বর্ণনা করতো, যা তারা মাত্র স্বপ্নে দেখেছে। বরোরা (Bororo)-র একটি গোটা গ্রামের সকল মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ, কে নাকি একজন শত্রুর গুপ্ত আক্রমণের স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নে বিশ্বাস করে মানুষ শোষণের শিকার পর্যন্ত হতো। রিচার্ড এম ডর্সন তাঁর *আমেরিকান ফোকলোর* বইয়ে স্বপ্ন সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকানদের ধর্মতুল্য অবিচল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে একজন ভূস্বামী দুটো লোককে খাটিয়ে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মিথ্যেমিথ্যি এই কথা বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে অমুক স্থানে অতো বড় এক গাদা গোবরের নীচে অনেক টাকা রয়েছে। লোক দুটো বড় এক গাদা গোবর সরানোর খাটুনিটা খামোখাই খেটেছিল। স্বপ্নের বাস্তবতা বা নির্ভুলতায় লৌকিক বিশ্বাস কতদূর যেতে

পারে, সে সম্পর্কে জে, এ, হ্যাডফিল্ড বর্ণিত একটি কাহিনী এরূপ : জনৈক আমেরিকান ভারতীয় একজন ধর্মপ্রচারকের বিরুদ্ধে একটি লাউ চুরি করার অভিযোগ এনেছিল শুধু এই ভিত্তিতেই যে সে এ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছে। এবং এই অভিযোগ সে করে চলেছিল তখনও, যখন দেখা যাচ্ছিল যে, বর্ণিত সময়ে সেই ধর্ম-প্রচারক ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মাইল দূরে ছিল এবং লাউটি তখনও গাছে যথাস্থানে ঝুলছিল (ড্রিমস এ্যাণ্ড নাইটমেয়ারস, পেঙ্গুইন বুকস)। অর্থাৎ, নিজের চোখ কিংবা অপর ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষ্য উপেক্ষা করে পর্যন্ত আদিম মানুষ স্বপ্নে বিশ্বাস করতো। যদি কোনো আদিম মানুষ স্বপ্ন দেখতো যে সে অপর কারো সম্পত্তির প্রকৃত মালিক এবং তৎকালীন মালিককে সেটা বলতো, তখন সেই ব্যক্তি তাকে বলতো, "নিয়ে নাও ওই সম্পত্তি, ওটা তোমার।"

পূর্বোল্লিখিত "আমেরিকান ফোকলোর" বইয়ে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেখানে মহক (Mahawk) উপজাতির একটি লোক একটি স্বপ্নের কথা বলে বসলে ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাটি তার সুন্দর বুননের কোটটি তাকে দিয়ে দেয়, এবং ওইভাবেই সে স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদা দেখায়। কিন্তু শোধ নেয়ার জন্যে সেই ব্রিটিশ সাহেব পরবর্তী সুযোগেই এমন একটি স্বপ্নের বিবরণ দেয়, যার ফলে প্রচলিত বিশ্বাসকে মান্য করতে গিয়ে সেই মহক মানুষটি তখন ৫০০০ একর জমি সাহেবকে দলিল করে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়, এবং বলে, "দেখুন উইলিয়াম সাহেব, আপনাকে আমি কখনোই স্বপ্ন দেখবো না, আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন-কঠোর স্বপ্ন আপনি দেখেন।" প্রতারণা এবং শোষণের উদ্দেশ্যে স্বপ্নের ঐশী মর্যাদা এবং কথিত সত্যতার এমন অপব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে মিলবে।

ওপরের দৃষ্টান্তেও অবশ্য বোঝা যায় যে, স্বপ্নকে সাধারণ মানুষ আত্মা কিংবা অনুরূপ কিছুর ক্রিয়া বলেই মনে করতো, যে কারণে শুধু নিজের নয়, অপরের স্বপ্নকেও সে মান্য করতো। মাকুসি (Macusi)-র এক ভারতীয় ছিল দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী, তাই যখন সে স্বপ্ন দেখলো যে তার নিয়োগকর্তা দুর্গম খাড়িপথ বেয়ে একটি নৌকো ঠেলে তোলার কাজে তাকে লাগিয়েছে, তখন ভোরবেলা সে একজন গরিব পঙ্গুকে রাতের বেলা ঘরের

বাইরে নিয়ে গিয়ে ওইভাবে খাটানোর জন্যে সেই নিয়োগকর্তাকে যথেচ্ছ বকাঝকা করলো ; এক্ষেত্রে প্রতিবাদী মানসিকতাকে নৈতিক শক্তি যোগালো আত্মা-কেন্দ্রিক স্বপ্ন-ধারণা।

স্বপ্নসূত্রে মানুষের আধ্যাত্মিকতা বেড়ে যাওয়ার অন্য সঙ্গত কারণও ছিল। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন, ভাবা স্বাভাবিক ছিল যে, ঘুমে-স্বপ্নে যে আত্মা সাময়িক বিদায় নেয়, মৃত্যুতে তা নেয় চিরবিদায়। তাছাড়া, মৃত মানুষকে স্বপ্নে দেখারও এমন অর্থ করা হতো যে জীবিতের আত্মা তখন মৃতের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, কিংবা মৃতের আত্মা জীবিতের রাজ্যে এসেছে, দেখা করেছে। এইভাবে পরলোক-সম্পর্কিত ধারণাদি জোর ভিত্তি পায়, আত্মার অমরত্বের ধারণাও। অন্তত এই বিশ্বাস দাঁড়ায় যে দেহ ধ্বংস হলেও, আত্মা বেঁচে থাকে। মানুষের মূল আধ্যাত্মিক ধারণার নির্মাণে স্বপ্নের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই ছিল। স্বপ্নদৃশ্য থেকে মানুষ পরলোকের বর্ণনা পর্যন্ত দিত। ই, বি, টেলর সেই মহক ভারতীয়দের কথা বলেছেন, যারা স্বর্গের সুরাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে বলতো স্বপ্নে এ-স্থানকে তারা যেমন দেখেছে। পরলোকে আত্মাদের বাস এবং "আত্মাদের রাজ্য স্বপ্নরাজ্য"। এইভাবে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, "আদিম মানুষদের ধর্মের ধারণাদি শেষ বিচারে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থার, বিশেষত তার স্বপ্নের সাথে জড়িত, নেহায়েৎ যদি তারা এসব থেকেই উদ্ভূত নাও হয়।" আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে, অধ্যাত্মিক ধারণাদির ভিত্তি এই ঘুম ও স্বপ্ন কত বেশি শারীরবৃত্তীয় তথা বাস্তব এবং ইহলৌকিক ব্যাপার।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহে স্বপ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভাব কি ছিল? প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায়ই স্বপ্নের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন পাওয়া যায়। লিন থর্নডাইক জানাচ্ছেন যে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০ সনের সময়কার চতুর্থ থট্‌মেসের (Thotmes IV) একটি স্বপ্ন এখনও রক্ষিত আছে। রা হরমাখু (Ra Harmakhu) নাকি স্বপ্নে থট্‌মেসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ঘুমনোর স্থানের পাশে বালুর মধ্যে স্ফিংক্সের একটি মূর্তি নির্মাণ করতে। এ ছাড়াও মিসরীয় যাদুকরদের ভাণ্ডারে স্বপ্ন দেখানোর এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যার যন্ত্র থাকতো,

স্বপ্ন–ব্যাখ্যাকে মিসরীয়রা গ্রহণও করতো খুব গুরুত্বের সাথে, স্বপ্ন-প্রতীকের মিসরীয় তালিকা এবং অভিধান পাওয়া গেছে। এবং স্বপ্নকে যে আত্মা এবং পরলোকের সাথে সংযুক্ত মনে করা হতো, তার প্রমাণ এও যে মৃতদেহের পাশে মিসরীয়গণ এই "স্বপ্নলোকের চাবি" রেখে দিত, যাতে প্রয়াত আত্মা কবরের পরপারের ভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

পরবর্তীকালে স্বপ্নের গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ—এসব ততদিনে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় পরিণত। তাই, স্বপ্ন তখন আর ভৌতিক–আধিদৈবিক পরজগতের প্রকাশমাধ্যম কিংবা আভাসদাতা শুধু নয়। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ভিত্তি কিংবা অংশ হিসেবে স্বপ্ন তখন ঐশী ভবিষদ্বাণী হিসেবেই বিবেচিত। এ রকমটি ঘটেছে প্রাচীন সব সভ্যতা ও ধর্মের ক্ষেত্রেই মিসরীয়, বেবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক, ভারতীয়, হিট্টাইট—সব। 'ভারতকোষ' পঞ্চম খণ্ডে বলা হয়েছে, "আদিম মানুষেরা বিশ্বাস করিতেন যে স্বপ্নের মাধ্যমেই দেবতা ও মৃত পূর্বপুরুষেরা জীবিতদের সহিত কথাবার্তা বলেন ও উপদেশাদি দেন।" স্বপ্নোদ্ভূত জ্ঞানের ধারণাই এভাবে সমর্থিত হয়।

মুসলিম রাজাদের দরবারে থাকতেন অভিজ্ঞ স্বপ্নব্যাখ্যাতাগণ। আরবীয় স্বপ্নতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আহমেদ ইবনে সিরিনের রচনা, বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য হয়ে যা পাশ্চাত্যেও পৌঁছেছিল।

উপনিষদে নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে একটি গোটা অধ্যায় রয়েছে। চীনে স্বপ্ন থেকে কর্মোপদেশ (prognostications) সংগ্রহ করা হতো, স্বপ্ন–ব্যাখ্যার জন্যে ছিলেন বিশেষজ্ঞগণ। জাপানেও স্বপ্ন-ব্যাখ্যা ছিল একটি লাভজনক ব্যবসায়। হিট্টাহিট রাজা তৃতীয় হাট্টাসিলিসকে (খৃ. পূ. ১২৯০–১২৬০) তার সিংহাসন–লাভের পথনির্দেশ নাকি তার অভিভাবক দেবী ইস্তার (Ishtar) স্বপ্নের মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন, হাট্টাসিলিসের পিতাকেও নাকি পাঠানো হয়েছিল একই স্বপ্ন–নির্দেশ। দেখা যাচ্ছে, ধর্মপ্রতিষ্ঠা, শাসনপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে স্বপ্ন–নির্দেশ নেমে আসতো, এসব ঘটনায় স্বপ্নের অলৌকিক তথা ঐশী ভাবমূর্তিটি খুবই প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হতো। একালের ফ্রয়েডের

নির্জ্ঞান-ভিত্তিক স্বপ্ন-ব্যাখ্যার সাথে স্বপ্ন-দেখার, বিশেষত স্বপ্ন-ব্যবহারের এইসব কৌশল একেবারেই মেলে না। বাংলাদেশে মুক্তাগাছার অদূরে কুতুবপুরে জনৈক জমিদার স্থানীয় কৃষক-অসন্তোষ ও আন্দোলনের মোকাবেলায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কৌশলকে কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন—স্থানীয় জনশ্রুতিতে তার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ রয়েছে।

অন্যান্য অনেক কিছুর মতো স্বপ্নের জন্যেও গ্রিকদের একজন দেবতা ছিল, নাম যার মরফিউস। এই মরফিউসের বংশবৃক্ষ থেকেও বোঝা যায় স্বপ্নকে গ্রিকরা কি চোখে দেখত, এবং কত বেশি গুরুত্ব দিত। মরফিউস ছিল ঘুমের দেবতা হিপ্‌নসের পুত্র, হিপনস আবার ছিল মৃত্যুর দেবতা থ্যানাটসের ভাই। স্বপ্ন ও ধর্মের মিলে-মিশে যাওয়ার ব্যাপারটি গ্রিক ও রোমানদের বেলায়ও দেখা গেছে। হোমার-হেরোডোটাস্‌রা এটাই স্বাভাবিক মনে করতেন যে, মানুষকে ঠকানোর জন্যে হলেও, নিজেদের উচ্চতর উদ্দেশ্য পূরণার্থ দেবতারা মানুষকে স্বপ্ন দেখাবেন (দ' ক্যাথোলিক এনসাইক্লোপেডিয়া, পৃ. ১৫৪)। প্ল্যাটো অবশ্য অতদূর যেতে রাজি হন নি, কিন্তু স্বীকার করেছেন যে স্বপ্ন দেবতাদের কাছে থেকে আসতে পারে।

দেবতাদের 'থানে' স্বপ্নাদেশের জন্যে 'হত্যা' দেয়ার হিন্দুধর্মীয় আচার গ্রিকদের ইতিহাসেও সত্য ছিল। হেরোডোটাস্ নাসামোনেদের (Nasamones) কথা বলেছেন, যারা দৈবনির্দেশ পাওয়ার জন্যে তাদের পিতৃপুরুষদের কবরের পাশে যেত, এবং প্রার্থনা করার পর ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখতো তাকেই সত্য মনে করতো। (*অরিজিন অব সিভিলাইজেশন এ্যাণ্ড দ' প্রিমিটিভ কণ্ডিশানস অব ম্যান,* পৃ. ২২৯)। এরূপ স্বপ্ন লাভ করার জন্যে তারা উপবাস করতো, ঔষধও সেবন করতো। আরোগ্য লাভ করার জন্যে পবিত্র স্থানে ঘুমিয়ে স্বপ্ন লাভ করার চেষ্টাও ছিল বহুল প্রচলিত। ভারতবর্ষের মতো গ্রিসেও এজন্যে কিছু নির্দিষ্ট মন্দির নির্ধারিত ও বিখ্যাত ছিল। পরবর্তীকালে 'incubation' নামে পরিচিত পবিত্র স্থানে ঘুমনোর এই রীতি খ্রিস্টানরাও গ্রহণ করে। মধ্যযুগ অতিক্রম করে এই প্রথা এখন অবধিও প্রায় প্রচলিত (*দ' সায়েন্স অব ড্রিমস,* পৃ.২১২)।

সক্রেটিসও স্বপ্ন থেকে দৈবাদেশ কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তিতে খুব বেশি বিশ্বাস করতেন (থর্নডাইক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭৬)। ডেমোক্রিটাস্ ভাবতেন যে অন্য জগৎ কিংবা আত্মা থেকে আগত কোনো মূর্তি ছিদ্রপথে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং অন্যদের আবেগ–অনুভূতি–পরিকল্পনা সম্পর্কে জানায় (থর্নডাইক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৫)।

এরিস্টোটল–সিসেরোর কিছু বস্তুবাদী বিচার–বিশ্লেষণের পটভূমিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের স্বপ্নকাহিনীই স্বপ্নের আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঐশী মাহাত্ম্যকে অনেকখানি ফিরিয়ে এনেছিল। জেনেসিস–এর ২০ অধ্যায়ে ঈশ্বর Abimelech–এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন যে সাবাহ্, আব্রাহামের স্ত্রী, এবং সাবাহ্‌কে সে যেন তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয়। বাইবেলের সর্ববিখ্যাত স্বপ্নগুলো দেখেছিলেন কিংবা ব্যাখ্যা করেছিলেন জোসেফ, এগুলোও বুক অব জেনেসিস-এ বর্ণিত। তিন জোড়া স্বপ্নের প্রথমটিতে দেখা যায় যে, জোসেফের শস্য–আঁটির কাছে তার ভাইদের শস্য–আঁটি মাথা দোলাচ্ছে এবং চন্দ্র, সূর্য ও এগারোটি তারা জোসেফকে অভিবাদন জানাচ্ছে। দ্বিতীয় জোড়া স্বপ্নে রয়েছে রাজা ফারাও–র খানসামা ও রুটিওয়ালাদের কাহিনী। তৃতীয় জোড়া স্বপ্নে রাজা ফারাও দেখতে পান যে, সাতটি কৃশ গরু সাতটি মোটা গরুকে এবং সাতটি কৃশ-জীর্ণ শস্য–শীষ সাতটি পূর্ণ–সতেজ শস্যশীষকে খেয়ে ফেলেছে। এ সব স্বপ্নই ছিল দৈবী–তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দু'জোড়া স্বপ্ন ছিল জোসেফের নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক, দীর্ঘ দুঃখ–ক্লেশের পর এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি তাঁর ক্ষেত্রে পূরণও হয়েছিল। তৃতীয় জোড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যার সূত্রে স্বপ্ন–ব্যাখ্যায় ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে জোসেফের পরিচিতি আরো বেড়েছিল, এবং জোসেফের পরামর্শমতো কাজ করায় ফারাও সেবার মিসরকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, অসীম ক্ষমতা এবং গৌরবেও ভূষিত হয়েছিলেন। খানসামা ও রুটিওয়ালার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জোসেফ বলেছিলেন, "ব্যাখ্যার মালিক কি ঈশ্বর নন?" এইভাবে স্বপ্নের ভিত্তিতে বারবার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে।

ড্যানিয়েলের স্বপ্নব্যাখ্যার বিবরণ থেকে স্বপ্নের ঐশ্বরিক উদ্ভবের তত্ত্ব আরো বেশি প্রমাণ-হয়। নেবুচাদনেজ্জারের স্বপ্ন যেন ধর্ম ও স্বপ্নের মধ্যকার সম্পর্কের স্তম্ভতুল্য। গিবিয়ন–এ রাজা সলোমন স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছে একটি সংবেদনশীল হৃদয় প্রার্থনা করেন। ইশ্বর কর্তৃক মানুষকে স্বপ্নপ্রেরণের ব্যাপ্যারটি বাইবেলে বহু স্থানেই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। Job xxxiii : 14, 15–এ বলা হয়েছে, ইশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেন "স্বপ্নে, রাতের দিব্যদৃষ্টিতে, যখন বিছানার ওপর শায়িত অবস্থায় মানুষের ওপর গভীর ঘুম নেমে আসে।" আবার স্বপ্ন–না–দেখানোটা ছিল ঈশ্বরেরই বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ। ঈশ্বর কোনোভাবেই ("স্বপ্নেও নয়, ইউরিম–মাধ্যমে কিংবা কোনো অবতারের মাধ্যমেও নয়"— I Samuel xxviii : 6) জবাব না পাঠানোয় স'ল (Saul) নবী বেদনাহত হয়েছিলেন।

বাইবেল–জাতীয় প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থে স্বপ্নের ধর্মীয় সংযোগ তথা ধর্মের স্বপ্নভিত্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই বলা হলেও, ওইসব স্বপ্ন ব্যাখ্যায় প্রতীকী এবং রূপক পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ফারাও–জোসেফের স্বপ্নব্যাখ্যায়-যেমন, এক্ষেত্রে মোটা ও কৃশ গরুর মতন প্রচলিত লৌকিক প্রতীক ও বিশ্বাসেরই প্রাধান্য রয়েছে বলে মনে হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতন গুহ্য (occult) বিদ্যার ব্যবহার সেখানে কম। তাছাড়া, বাইবেলে স্বপ্ন সম্পর্কে সতর্ক করে এরূপ বলা হয়েছে— "অসংখ্য স্বপ্ন এবং কথাবার্তার মধ্যে অনেক মিথ্যাও রয়েছে।" তৎসত্ত্বেও, বাইবেলে–বর্ণিত স্বপ্নসমূহের মানবিক ও সাহিত্যিক মূল্যের কারণেই স্বপ্নতত্ত্বের জনপ্রিয়তা অতঃপর নিঃসন্দেহে বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ের অনেক খাবনামা–জাতীয় পুস্তককে জোসেফ–ড্যানিয়েল–ইজেকিয়েল প্রমুখের নামেই চালানো হয়েছে।

তবে এইসব খাবনামা ইত্যাদির পরও মধ্যযুগে এসে কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চরিত্রের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবেই জোরদার হয়, ধর্মীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যার এ যাবৎকার প্রাধান্য হ্রাস পায়। এবং একই সাথে এও বলা দরকার যে, অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বপ্নব্যাখ্যারও বস্তুবাদী ধারণাটি এ—সম্পর্কিত ভাববাদী ধারার সমান সত্য ও সমান প্রাচীন। সেটা বোঝা যায় প্রাচীন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নবেত্তা বলে পরিচিত (ফ্রয়েড–উল্লেখিত)

আর্টেমিডোরাস (অব ডালসিস)–এর ভূমিকা থেকে, এরিস্টোটল–সিসেরোদের ব্যাখ্যা–বক্তব্য থেকেও।

আর্টেমিডোরাস এবং তাঁর বিখ্যাত স্বপ্ন–বিষয়ক বই *অনিরো ক্রিটিকন*–এর উল্লেখ না করলে স্বপ্নব্যাখ্যার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। অথচ, এই আর্টেমিডোরাস প্রাচীন কালেই স্বপ্নব্যাখ্যার যে–শ্রেণীবিভাগ করেন, তারই মধ্যে দৈবী উৎসের স্বপ্নের একটি অংশ যেমন ছিল, তেমনি ছিল শারীরিক কারণে উদ্ভূত স্বপ্নের অংশও। অর্থাৎ, শুধু অলৌকিক নয়, লৌকিক ও বাস্তব উৎসের স্বপ্নও সেই প্রাচীন কালেই চিহ্নিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আর্টেমিডোরাস ছিলেন একজন যথার্থ স্বপ্নব্যাখ্যাতা, তার অধিকাংশ বইই স্বপ্নবিষয়ক। "অনিরোক্রিটিকন" মধ্যযুগে বহু ভাষায় অনূদিত ও ব্যাপক প্রচারিত হয়, উৎসাহী পাঠক এ বইটির রবার্ট উড–কৃত অনুবাদ "দ" ইন্টারপ্রিটেশান অব ড্রিমস," (লন্ডন, ১৭৪০) খুঁজে পেলেও পেতে পারেন।

De Somno et Vigilia, De Somnis এবং *De Divinatione per Somnum* বইগুলোতে এরিস্টোটল স্বপ্ন ও ঘুম সম্পর্কে লিখেছিলেন। এবং *De Somnis* বইয়ের দ্বিতীয়–তৃতীয় অধ্যায়ে এরিস্টোটল লিখেছেন, কোনো পারলৌকিক কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। এরিস্টোটলের অভিমত হচ্ছে, ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার পরও ইন্দ্রিয়ানুভূতির যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তারই প্রভাবে মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে যে মানুষ দৈবী অর্থ ও ইঙ্গিত লাভ করে, সে–সম্পর্কে এরিস্টোটলের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা তাকে তুচ্ছও করতে পারি না, আবার অসংশয় অবস্থায় গ্রহণও করতে পারি না। এরিস্টোটল বলেছিলেন, যাকে আমরা দৈবী স্বপ্ন (prophetic dream) বলি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটনাযোগের ব্যাপার মাত্র। তিনি আরও বলেছিলেন, প্রারম্ভীয় (incipient) কোনো রোগের ক্ষেত্রেই কেবল স্বপ্নের ভবিষ্যৎ আভাস–দানের সুযোগ রয়েছে, কারণ, আমাদের অচেতন মনোজগতে যা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাকারে বর্তমান, স্বপ্ন তাকে পরিবর্ধিত রূপে প্রতিফলিত করতে পারে। বিস্ময়কর যে, মস্কো থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত কে, প্লাটানভের পুস্তক *সাইকোলজি এ্যাজ ইউ মে*

লাইক ইট-এর ২৯ পৃষ্ঠায় যা লেখা হয়েছে, তার সাথে এরিস্টোটলের সর্বশেষ এই বক্তব্যের অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে; প্লাটানভ লিখেছেন, "অনেক সময় দিনের বেলাতে কোনো প্রারম্ভীয় রোগ নজরে আসে না, কারণ তখন গুরু মস্তিস্ক বিভিন্ন শক্তির অনেক উদ্দীপকের প্রতি উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু, রাত্রে যখন বাহ্যিক উদ্দীপনা থাকে না, কিংবা তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, এইরূপ বেদনা-অনুভব তখন চেতনায় পৌছায় এবং পরিস্থিতিগত স্বপ্নের আকার ধারণ করে।" প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আই পি পাভলভের অনুসারী কে, প্লাটানভের সাথে এরিস্টোটলের এমন মতসাদৃশ্য প্রকৃত বিস্ময়কর নয় কি? পাভলভ তো আধুনিক-যুগের শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানী।

স্বপ্নের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকার হিসেবে সিসেরোর নামও সমান উল্লেখযোগ্য। *De Divinatione* বইয়ে সিসেরো স্বপ্নের সকল দৈবী ব্যাখ্যাকেই ভাগ্যগণকদের কূটকৌশল হিসেবে বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। সিসেরোর মতে, স্বপ্ন কেবল অসুস্থতার পূর্বাভাস দিতে পারে। কারণ, তাঁর মতে, স্বপ্ন ও শারীরিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

স্বপ্ন-সম্পর্কে নিঃশর্ত-অসংশয় মনোভাবের বিরুদ্ধে বাইবেলে বলা হয়েছে, বলেছি। উপনিষদেরই কি স্বপ্নের অলৌকিক তথা ভাববাদী ব্যাখ্যায় পূর্ণ সায় রয়েছে? পূর্বোল্লিখিত প্রশ্ন-উপনিষদ-এর এক স্থানে বলা হচ্ছে :

"স্বপ্নাবস্থায় মনোরূপ দেবতা স্বীয় বিভূতি অনুভব করেন। জাগ্রত অবস্থায় যাহা-যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাই যেন পুনরায় দেখেন, যাহা শোনা গিয়াছে, তাহাই পুনরায় শোনেন। দেশান্তরে ও দিগন্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে, তাহাই যেন বারেবারে অনুভব করেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ (সত্য) ও অসৎ (কল্পিত) এই সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বাত্মক হইয়া সমস্ত দেখেন" (*উপনিষদ*, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃ: ১৮৬)।

উপনিষদ্-এর শ্রুতির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকর শংকর কি বলেন, তাও লক্ষ্য করার মতো :

"চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কর্ম-সম্পাদনে বিরত হইলেও, দেহরক্ষার জন্যে প্রাণাদি বায়ুসকল সুষুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তীকালে মনোরূপী দেবতা সূর্যের রশ্মি সংবরণের ন্যায় কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া স্বপ্নে বিষয়-বিষয়ী লক্ষণাত্মক অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি দর্শন করিয়া থাকেন।...... কিন্তু একেবারে অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় না, কারণ তাহার উপর বাসনা জন্মিবার কোনোও সম্ভাবনা থাকে না" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭)। অর্থাৎ, পাভলভ-কথিত মস্তিস্কের নিস্তেজিত এবং অনিস্তেজিত অংশের এবং অনিস্তেজিত অংশের কারণে স্বপ্নের উদ্ভবের আভাস এবং আংশিকভাবে হলেও, বস্তুবাদী ও কার্যকারণ-তত্ত্ব-সমর্থিত বক্তব্য উপনিষদের উপরোদ্ধৃত অংশে রয়েছে।

স্বপ্নের বস্তুবাদী কারণব্যাখ্যার ইতিহাসে স্বনামধন্য চিকিৎসক-দার্শনিক গ্যালেনের নামও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। অনতিপ্রাচীনদের মধ্যে তিনিও স্বপ্নের মধ্যে চিকিৎসা-সূত্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। শারীরবিদ্যার অগ্রগতির তখনকার পর্যায়ে গ্যালেনের অভিমত ছিল, স্বপ্নে আগুন দেখার অর্থ হচ্ছে রোগীর রয়েছে হলুদ পিত্তের বিপত্তি। আর, স্বপ্নে বাষ্প কিংবা অন্ধকার দেখার অর্থ হচ্ছে রোগীর সমস্যা কালো পিত্তের। গ্যালেন স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীগত মূল্যে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর এ-বিশ্বাসও ছিল যে, স্বপ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও চিন্তাভাবনা দ্বারাই প্রভাবিত।

মধ্যযুগে এসে সাক্ষাৎ মেলে ম্যাক্রোবিয়াসের। আগেই বলেছি, এসময় ধর্মীয় ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে মেলাতে চাওয়া হয়েছিল। যেমন, এই ম্যাক্রোবিয়াস-কৃত স্বপ্নের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অরাকুলাম (oraculum) এবং ভিসিও (visio)-ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে দৈবী ও অলৌকিক চরিত্রের। আবার, ইনসমনিয়া (insomnia) এবং ফ্যান্টাস্‌মা (phantasma)-ধরনের স্বপ্ন শারীরিক অসুস্থতার ফল, এবং সমনিয়াম (somnium) স্বপ্ন মন-সম্পর্কিত এবং রহস্যার্থপূর্ণ। ম্যাক্রোবিয়াস অবশ্য খুব মৌলিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন বরং তিনি অনেকটা সংকলক-সম্পাদক-ধরনের। তাঁর স্বপ্ন-ধারণার সাথে অদ্ভুত মিলও রয়েছে পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন স্বপ্নবেত্তা আর্টেমিডোরাসের স্বপ্নালোচনার।

যা-ই হোক, মধ্যযুগের স্বপ্নব্যাখ্যায় চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ধারাটির বিজয়েরই এ এক প্রমাণ, (যদিও পরবর্তীকালে আবারও নানা যুগোপযোগী বেশে ও আকারে এ-সম্পর্কিত ভাববাদী ধারাটির সাময়িকভাবে প্রবল হয়ে উঠতে অসুবিধে হয় নি)। বলা চলে, গ্যালেনের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় স্বপ্নব্যাখ্যাই বিকশিত হয় মধ্যযুগের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু সিনাহ, (৯৭৮-১০৩৬ খ্রি:) এবং আবু রুশদ (১১২৬-১২৯৮ খ্রি:)-এর মতামতের মধ্যে। আর, ঘুম ও স্বপ্ন সম্পর্কে এই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যা বলেছিলেন, তার মধ্যেও আই. পি. পাভলভের অভিমতেরই সমর্থন মেলে।

আবু সিনাহ্‌দের মতে virtus (virtus naturalis; virtus spiritualis কিংবা vitalis এবং virtus animala কিংবা animalis)-এর মাধ্যমে যুক্তিচালিত মানবাত্মা (the reasonable human soul) শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। virtus animalis-এর স্থান হচ্ছে মস্তিস্কে, এবং কাজ করে দুটো পৃথক পদ্ধতিতে : যুক্তি, কল্পনা ও স্মৃতির মাধ্যমে, অভ্যন্তরীণ পথে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ, স্নায়ু ও মাংসপেশীর স্বতঃস্ফূর্ত গতিপথে, বাহ্যিকভাবে। এইসব দায়িত্ব ও পদ্ধতিসহ virtus animalis-এর অবস্থান virtus naturalis-এর ওপরে। এবং virtus animalis শুধু ক্ষুধা, পরিপাক, সংরক্ষণ ও বহিস্করণের কাজগুলো করে। ঘুম এলে মাংশপেশি ও স্নায়ুর নিয়ন্ত্রক virtus animalis তার দায়িত্ব পালন থেকে অবসর নেয়, এবং virtus naturalis স্বাধীনভাবে কাজ করে জাগ্রত অবস্থায় ব্যয়িত দেহের উত্তাপ ইত্যাদি পুনরায় সংগ্রহ করে। স্বপ্ন এই গোটা শারীরিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং দেহাভ্যন্তরের পরিস্থিতির প্রতিফলন। এ-ক্ষেত্রে শারীরিক উপাদানসমূহের মধ্যকার স্বাভাবিক ভারসাম্যের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতিই স্বপ্নের আকারে ধরা পড়ে। তবে, এইসব কমবেশি শারীরবৃত্তীয় তথা বৈজ্ঞানিক ঝোঁকের ধ্যান-ধারণার পরও আবু সিনাহ্‌দের তত্ত্বেই আবার অবতার-প্রেরিত চরিত্রের কথাও বলা হয়।

মধ্যযুগের চিকিৎসকরাও স্বপ্নের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, সে-সূত্রেও স্বপ্নের লৌকিক-অলৌকিক উভয় ধরনের কারণবোধের সত্যটি

প্রতিষ্ঠিত হয়। সোম্‌নিয়াম ন্যাচারাল (somnium natural)–ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে শারীরিক উপাদানের (humours, complexions. ইত্যাদির) কারণ–প্রসূত, সোম্‌নিয়াম এ্যানিম্যাল (somnium animal)-ধরনের স্বপ্নরা জাগ্রত অবস্থার উদ্বেগ এবং অস্থিরতার ফল, এবং সোম্‌নিয়াম কোলেস্টে (Comnium coleste)–ধরনের স্বপ্ন জন্ম নেয় গ্রহ–নক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রণকারী একটি আত্মা ও বোধের ফসল হিসেবে। উল্লিখিত তৃতীয় ধরনের স্বপ্ন যদি ভোর রাতে দেখা যায়, তাহলে তাদের দিকনির্দেশ নাকি হয় অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ, "শারীরিক উপাদান (humours) এবং রক্তাতিশয্য (repletion) থেকে মুক্ত থাকায় মন তখন স্বর্গীয় বিভূতি গ্রহণে সর্বাধিক প্রস্তুত থাকে।" বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে মধ্যযুগের স্বপ্নভাবনা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে কুসংস্কার ও ভাববাদের কানাগলিতে।

মধ্যযুগের ধর্মগুরুগণ অবশ্য যথারীতি অবতার–প্রেরিত স্বপ্নেই অধিক আগ্রহী ও বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তারা একে দিব্যদৃষ্টি, এবং পরমানন্দের মতন অলৌকিক অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করতেন। সেন্ট অগাস্টাইন যেমন অদ্ভুতের (fantasy) সমস্যা নিয়ে খুব চিন্তা করতেন — সে–অদ্ভুতের যত রূপই থাক, জাগ্রত অবস্থার কিংবা স্বপ্নপ্রাপ্ত, দিব্য–দৃষ্টি (visions), আমূলপ্রত্যক্ষ (hallucinations), পরমানন্দ (ecstasies), ইত্যাদি, এবং এসবের সাথে স্বর্গীয় কিংবা কোনো কুহকী যোগাযোগ থাক আর না–ই থাক। সেন্ট আলবার্ট দ' গ্রেটও (১১৯৩–১২৮০ খ্রি:), এরিস্টোটলের স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও, অবতার-প্রেরিত এবং টেলিপ্যাথিক স্বপ্নে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি অবশ্য রূপক (metaphorical) চরিত্রের স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে কবিদের কাজ বলেছিলেন, কারণ, রূপক, উপমা, ইত্যাদি নির্মাণে নাকি কবিরাই অভ্যস্ত।

আদিম মানুষের স্বপ্ন–বিষয়ক ভাবনা–চিন্তা মধ্যযুগে প্রবল হয়ে ওঠে, এবং মধ্যযুগে পেরিয়েও অগ্রসর হতে থাকে। রেনেসাঁ যুগের পরে স্বপ্নভাবনার যে সাময়িক ও তুলনামূলক প্রায়–বিরতি দেখা যায়, সিগমাণ্ড ফ্রয়েডের সাইকোএনালিসিসের পর্যায়ে এসে নিশ্চয় তার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয়। সেন্ট

অগাস্টাইনও ভাবতেন যে স্মৃতির ভাণ্ডার বলে মানুষের একটি সম্পদ রয়েছে, যা জাগ্রত এবং সক্রিয় হয়, "ঐশ্বরিক শক্তির গোপন (অচেতন) পরিকল্পনা অনুসারে, কিংবা বাসনা তথা ব্যক্তিক এবং আবেগী (affective) প্রবণতা-অনুসারে।" অতঃপর ফ্রয়েডকে সেন্ট অগাস্টাইনের যোগ্য উত্তরসূরি বলতে অনেকেরই আর কোনো আপত্তি থাকে না। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন-শ্রেষ্ঠ ভাববাদী প্ল্যাটোর সাথে ফ্রয়েডের স্বপ্নচিন্তাগত সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন।

সাহিত্যে স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যে অর্জুন যখন সুরূপা চিত্রাঙ্গদার সান্নিধ্যে অভিভূত, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজেকেই, তখন সত্যের নিশ্চয়তা চেয়ে বলেন,

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, স্বপন নও।

চিত্রাঙ্গদা যে মিথ্যে কেউ নয়, সে প্রতিশ্রুতি চেয়েই অর্জুনের অমনটা বলা। মিথ্যের সমার্থক হিসেবেই এখানে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন' শব্দটির ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ এরূপও লিখেছিলেন, 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে।' আরো অনেক উদাহরণ দিয়েই প্রমাণ করা যাবে রবীন্দ্রনাথের মনে সত্যের আভাসরূপ হিসেবে স্বপ্নের ধারণা ছিলই না যেন ; 'সত্য'-অর্থে স্বপ্ন শব্দটি কদাচিৎ লিখেছেন তিনি।

এর অর্থ এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন-নামক মানবিক অভিজ্ঞতাটির বৈচিত্র্যে-বর্ণিলতায় বিন্দুমাত্র কম আগ্রহী ছিলেন। একটি সহজ হিসেবে বরং দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ গান ও কবিতার মধ্যে কম করে উনত্রিশটি শুরু হয়েছে স্বপ্ন বিষয়টির অবতারণা-যোগে, তাদের প্রথম ছত্রে স্বপ্ন-শব্দটি রয়েছে।

তা ছাড়া, কল্পনা-বিস্তারের প্রচলিত কাঠামো হিসেবে কিংবা আস্থানির্মাণকামী পরিবেশ হিসেবে স্বপ্নের উপযোগিতা উপলব্ধির প্রমাণও মেলে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায়, আপাত-অলৌকিকেও রবীন্দ্রনাথ হয়তো-বা গেছেন কখনও, স্বপ্নবাহনে। কিন্তু, স্বপ্ন সম্পর্কে প্রকৃত আধুনিক মানুষের ধারণার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নবোধের অধিকাংশ মিল।

সাধারণভাবেও দেখা যাবে যে, প্রতিটি দেশের প্রতিটি যুগের সাহিত্যই স্বদেশীয় সমসাময়িক স্বপ্নভাবনার পরিচায়ক। গ্রিক পুরাণে–মহাকাব্যে–নাটকে স্বপ্ন সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের বিশ্বাসের–মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ট্রয়ের উপাখ্যানের শুরুতেই রয়েছে এক ভয়াবহ স্বপ্ন বুঝি–বা, প্যারিসের জন্মের পূর্বে মা হেকাবি স্বপ্ন দেখছেন যে তিনি একটি অগ্নিমশাল জন্ম দিতে যাচ্ছেন, যার শিখা ছড়িয়ে পড়বে গোটা ট্রয়নগরী জুড়ে। সে স্বপ্নের তখন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দাঁড়ালো যে হেকাবির সন্তান মাতৃনগরীর ধ্বংসের কারণ হবে। তার অর্থ : সংশ্লিষ্ট পুরাণকারের রচনায় স্বপ্নকে সত্য ভাবার তৎকালীন প্রচলনই ধরা পড়েছে। *ওডিসির* ঊনবিংশ অধ্যায়ের শেষে পেনেলোপি ছদ্মবেশী ওডিসিয়াসের কাছে নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দেন, তাতে একটি বড় ঈগল ঝাঁপিয়ে পড়ছে পেনেলোপির হাঁসের পালটির ওপর এবং তাদের মেরে ফেলছে। সে ঈগল পরে ফিরে এসে স্বপ্নের অর্থও জানায় : পেনোলপির স্বামী পেনেলোপির প্রাণিপ্রার্থীদের খুন করবে। স্বপ্ন তার প্রচলিত অর্থে–তাৎপর্যেই সব সময় সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আর, বিশ্বজগৎ এবং মানুষের দৈহিক প্রকৃতি, ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের ওপরই সবসময় স্বপ্ন–সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাদি নির্ভর করেছে।

স্বপ্নকে সত্য ভাবার, নিদেন অর্থপূর্ণ মনে করার মধ্যেই সাহিত্যে রূপক হিসেবে স্বপ্ন কাঠামোটি ব্যবহারের অবকাশ। আবার কাহিনী তথা কল্পনাবিস্তারের সহজ কাঠামো হিসেবেও স্বপ্নের এক ধরনের ব্যাপক উপযোগিতা ছিল। এবং সেক্ষেত্রে courtly love–জাতীয় কাহিনী এবং প্রেমাতুর আবেগ–অনুভূতির প্রকাশক–আঙ্গিক হিসেবেই স্বপ্নের অধিক মূল্য। সমাজের বৃহৎ প্রয়োজনবোধগুলোর ভারসাম্যও নির্ধারণ করে দিয়েছে বিভিন্ন দেশে, যেমন, ফ্রান্সে এবং ইংল্যান্ডে, স্বপ্নের ব্যবহার কিরূপ হবে। ফরাসি সাহিত্যের একটি যুগে স্বপ্ন–কাঠামোয় ভর করেছিল courtly love এবং প্রেম–ধরনের আবেগ–অনুভূতির খুটিনাটি বর্ণনা। কিন্তু, ইংল্যান্ডের সাহিত্যে আগে থেকেই প্রবল ছিল রূপকের (allegory) ধারাটি। ফরাসি প্রভাবও ইংল্যান্ডের সমাজে ও সাহিত্যে রূপকের এই গুরুত্বকে কমাতে পারে নি। স্বপ্ন–কাঠামোটি বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় ইংল্যান্ডের কবিতা পূর্বের তুলনায়

নমনীয়, রঙিন এবং আলোকোজ্জ্বল হয়েছে ঠিক, কিন্তু তার সুনীতির এবং কঠিন–কঠোর সংযম ও নিষ্ঠার মনোভাব বিন্দুমাত্র দুর্বল হয় নি। ইংল্যান্ডের এই সংযম যুক্ত ছিল প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের প্রয়োজনবোধের সাথে। মধ্যযুগীয় ইংরেজি রচনায় ধর্মীয়–সামাজিক–রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক বিবরণ ও ব্যঙ্গই প্রধান। স্বপ্ন–কাঠামোটি সেখানে শেষ কথা হতে পারে নি। 'The Parlament of the Three Ages' কবিতায় স্বপ্নের ফুল্ল বুনন প্রায়শই হালকা এবং ক্ষীণ হয়ে পড়ে, এবং হরিণ–শিকারের মতোন নিরেট বাস্তবদৃশ্য উপস্থিত হয়। 'Mum and the Sothsegger' কবিতার স্বপ্নালুতা জুড়ে উপস্থিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক দীর্ঘ বর্ণনা, কিন্তু সেখানেও সবুজ বৃক্ষ, মিষ্টি ফুলের আবেশ ইত্যাদি ভঙ্গ হয় নতুন চষা জমি, ভেড়া, গরু, ঘোড়ার মতো পরিচিত দৈনন্দিন বস্তুর অনুপ্রবেশে। *The Romance of the Rose* তথা ফরাসি স্বপ্ন–কাব্যের ঐতিহ্যবাহী সেই বাগানদৃশ্য এখানে আসে না, কিংবা টেকে না, ইংরেজি স্বপ্নকাব্যের লেখকগণ বুঝি সত্যদ্রষ্টার সেই অন্য অর্থেই স্বপ্নদ্রষ্টা, গভীরতর সত্যকে যিনি উদ্বুদ্ধ ভাষায় বর্ণনা করেন।

মধ্যযুগীয় ইংরেজি স্বপ্নকাব্যে স্বপ্নের কাঠামোটি অনেক সময় রচনার শুরুতেই শুধু রয়েছে, সুশৃঙ্খল ঘটনাক্রমের পরবর্তী নিখুঁত বর্ণনা ঘুমন্ত বা স্বপ্নাচ্ছন্ন কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষে স্বাভাবিক অসঙ্গতি–অবাস্তবতায় পূর্ণ আর থাকে নি। বিষয়ের এবং বিষয়–বিবরণের বৃহত্তর দাবির কাছে স্বপ্নের আঙ্গিক, পরিবেশ ইত্যাদি তাদের নিগড় শিথিল করে দিয়েছে; চিরদিনই এরা যেমন দেয়।

কবি স্বপ্নকে যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসের মর্যাদায় আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন, তেমনি সামাজিক–অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনে স্বপ্নের অলৌকিকতা এবং কাহিনী–চারিত্র্যকে কাজেও লাগান। Wynnere and Wastoure কবিতায় দুটো বিরোধী সামাজিক–অর্থনৈতিক শ্রেণীকে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনীর চেহারায় দাঁড় করান কবি, প্রয়োজনীয় রূপান্তরসাধনের জন্যে স্বপ্নের কাঠামোকে সেখানে তিনি ব্যবহার করেন, স্বপ্নের ছায়ায় নিরাপদে নিয়ে আসেন শ্রম, মজুরি, দ্রব্যমূল্য, খাদ্য–বস্ত্র,

ইত্যাদির এবং পুরোহিত ও ধনিক শ্রেণীর আচরণের প্রশ্নাদি। লোভ, নষ্টামো, বিলাস, অপচয় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রশ্নটিই যেন প্রধান।

'Mum and the Sothsegger' কবিতায় স্বপ্নের অলৌকিক উৎসের সুযোগ নিয়ে রাজা হেনরি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অপকর্ম–অবিচারের বিরুদ্ধে কবি তাঁর অভিযোগ উচ্চারণ করেন। The Crowned King কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা সত্য। এই দুটো কবিতায় রাজাকে হয়তো পরামর্শও দেয়া হয় ; তজ্জন্য-প্রয়োজনীয় সাহস ও নিরাপত্তা খুঁজতেই বুঝি দৈবী–উৎসের–অধিকারী বলে বিবেচিত স্বপ্নের কাছে যাওয়া। সামাজিক–অর্থনৈতিক বাস্তবের গুরুভারকে লাঘব করার জন্যে, অর্থাৎ নিরস বাস্তবকে উপভোগ্য করে তোলার জন্যে যেমন, নানাদিক থেকে সুবিধেজনক একটি কাঠামো খুঁজেও সাহিত্যে স্বপ্ন–মাধ্যমের ব্যবহার। জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিংবা অন্যায়–অবিচারে ক্ষুব্ধ কবি সুদিনের স্বপ্ন দেখতেন, এবং আক্ষরিক কিংবা প্রচলিত অর্থের স্বপ্নকে আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করতেন। ঈশ্বরের নির্দেশ নেমে এসেছে, কবি শুধু তাকে ভাষা দিচ্ছেন। আর অন্যভাবে দেখলে, স্বপ্ন তো স্বপ্নই, কেউ তাকে গুরুত্বের সাথেও গ্রহণ করতে পারেন, আবার তুচ্ছ জ্ঞানও করতে পারেন। রাজকোষ এবং অন্যান্য বিপত্তির প্রতিকার–প্রয়োজনেই বুঝি স্বপ্ন এক অতিকার্যকর আবহ।

স্বপ্ন কাঠামোর কৌশলী এবং প্রতিবাদী প্রয়োগ অন্যান্য সাহিত্যের বেলায়ও সত্য। বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'স্বপ্নদর্শন' রচনাটি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে বঙ্গদেশ কি দুর্যোগ–দুর্দশার সম্মুখীন, তার সরাসরি বিবরণ–রচনায় অসমর্থ হয়ে, কিংবা হতে পারে, সেই নিদারুণ বাস্তবতাকে আরো মর্মস্পর্শী রূপ দেয়ার জন্যে বিহারীলাল পনেরো পৃষ্ঠার এক গদ্য রচনায় স্বপ্ন-আবহকে চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন।

ধর্ম ও স্বপ্ন–প্রশ্নে বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের ধারা এবং ইংরেজি কবিতার পার্স–পীয়ার্স দ' প্লাউম্যান–ধারার মধ্যে মিল রয়েছে। লক্ষ্য করে অবাক হতে হয় যে মঙ্গলকাব্যের ধারার অন্যতম *চণ্ডিমঙ্গল* কাব্যেরও

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রচিত হওয়ার যে-বিবরণ কবিতাতেই কবিকঙ্কণ নিজে প্রদান করেন, তাতেও সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশ্ন, অভিযোগ-প্রতিবাদ ইত্যাদি স্পষ্ট উচ্চারিত হয় :

সরকার হইল কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে যায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।

উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে কবিকঙ্কণ 'কুচট্ট্যা নগরে' যখন পৌঁছেন, তখন 'ক্ষুধা ভয় পরিশ্রম' নিদ্রাভিভূত কবিকে 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'। শুধু দেখা-দেওয়াই নয়, আরো স্পষ্ট করে কবি বলেছেন যে আদিষ্ট হয়েই তিনি লিখেছেন :

দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশের ব্যাপারটি একটি নিয়মিত রীতিতে পরিণত হয়। স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, দেব-দেবী-সম্পর্কিত রচনাকর্মের প্রতি পাঠকের আস্থা অর্জন করার জন্যেই কি কবিরা এসব দৈবী স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন? না-কি, প্রেরণা-প্রেষণা সংগ্রহ করার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই এ-রকম বলা? মনসামঙ্গল-এর অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান কবি বিজয়গুপ্তের ক্ষেত্রেও দৈবী স্বপ্নাদেশ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বক্তব্যের পূর্বোল্লিখিত মিশ্রণই সত্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন ... ... বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি তাহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে।"

বর্তমান আলোচনায় স্বপ্নতুল্য ঘটনা, যেমন দিব্যরূপদর্শন (visions), ইত্যাদিকে গণ্য করলে আমরা প্রসঙ্গচ্যুত হবো না এ-কারণে যে, সমসাময়িক লৌকিক বিশ্বাসের পর্যায়ে এ সবই ছিল স্বপ্নের সদৃশ পরিমাণ অলৌকিক ব্যাপার। স্বপ্নালোচনা সেক্ষেত্রে রামায়ণ পর্যন্তও প্রসারিত হতে পারে, রাম হনুমানকে তার বিষ্ণুরূপ দর্শন করান, রামায়ণের আদিকাণ্ডের শুরুতেই 'রামায়ণের চারি অংশে প্রকাশ'। অপরপক্ষে, মহাভারতেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, ইন্দ্রের পাঠানো রথে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার পথে অর্জুনও অনেক কিছু দেখেন, 'বাসুকীনিমন্ত্রণে পাতালে পার্থের যাত্রা'ও একই পরিমাণ 'স্বপ্নমোহ'-র পরিচায়ক। এইরূপ স্বর্গযাত্রায় বুঝি মনসামঙ্গল-এর কবিরও বিশ্বাস, বেহুলা ভেলায় চেপেই স্বর্গযাত্রা করে। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনের কথা আমাদের মনে পড়ে। রূপ-ধারণের ব্যাপারটিও বুঝি মঙ্গলকাব্যের যুগে পৌঁছায়, কালকেতু-কাহিনীতে দেখা যায় ভগবতীর গোধিকারূপ-ধারণ, চণ্ডীর মৃগীরূপ, ইত্যাদি। আর, আমাদের মূল আলোচ্য, কবির স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি, পৌঁছে যায় ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, যিনি 'রাজাদেশের পরেও স্বপ্নের অবতারণা করতে বিরত হন নি' (বাংলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত, অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)। *অন্নদামঙ্গল*-এর অন্নপূর্ণা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'স্বপ্নে দেখা দিয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।' শিবও এখানে 'মোহনমূর্তি ধারণ' করেন, নিশ্চয়ই স্বপ্নে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এও শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে তার যুগলরূপ দেখান।

মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটিতে দেখা যায়; সুরভির মৃত্যুতে কঙ্ক গৃহ পরিত্যাগ করে 'নিম্ব বৃক্ষতলে' শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ; তখন

> স্বপ্ন দেখিল কঙ্ক রাত্রিশেষ-কালে
> শ্মশান থালাতে পড়ে জ্বলন্ত অনলে,
> চৌদিকে পিশাচ করে তাণ্ডব
> কান্দে কঙ্ক প্রাণে মরি, রাখহ জীবন।

দেখা যাচ্ছে, এখানে চরিত্রটির মানসিক অবস্থার সাথে তার স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। তার অর্থে, লোকসাহিত্যের পর্যায়ে এসে স্বপ্ন আর

দৈবীউৎসজাত নয়, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবের সাথে যুক্ত হয়ে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

স্বপ্নে আত্মা দেহ-বহির্ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়—এই অতি প্রাচীন ধারণা থেকে শুরু করে পবিত্র স্থানে ঘুমিয়ে স্বপ্ন তথা দৈবী নির্দেশ প্রাপ্তির (আদিম ও খ্রিস্টান) প্রথা, এবং স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির তার নিকটজনকে দেখা-দেয়া এবং তার তখনকার শুভাশুভ জানানো পর্যন্ত নানা সমসাময়িক স্বপ্নধারণাকে Pearl-এর কবি চমৎকার ব্যবহার করেছেন। *বাইবেল, ডিভাইন কমেডি, দ' রোমান্স অব দ' রোজ* এবং *অলিম্পিয়া ইকলগ* (Boccaccio'র Olympia Eclogue)-এর মত স্বপ্নপ্রশ্নে অতি-উল্লেখযোগ্য রচনা থেকেও স্বপ্নধারণা নিয়েছেন *Pearl*-এর কবি। *Pearl*-এর সাথে সাদৃশ্য-সূত্রেই আরও একটি বিখ্যাত স্বপ্নসাহিত্য, বোয়েথিয়াস-এর *De Consolatione Philosophie*-এর নামোল্লেখ করতে হচ্ছে, শোকাহত কবির নিকট পার্ল যেভাবে উপস্থিত হয়, বোয়েথিয়াসের নিকট Philosophyও একই চেহারা নিয়ে হাজির হয়, 'চোখের জলে এবং দুঃখে'। *Pearl*-প্রসঙ্গে এসব অধিকতর বিখ্যাত স্বপ্নসাহিত্যের উল্লেখ অন্তত এই যুক্তিতে সঙ্গত যে স্বপ্ন-কাঠামোটির নির্মাণে ও রক্ষায় *Pearl*-এর কবি আগাগোড়া অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দেন। "আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি যে, কবিতাটির ভিত্তি কোনো প্রকৃত স্বপ্নই ছিল কি-না". (*দ' এনচ্যান্টেড ল্যান্ডস্কেপ*, আহসানুল হক)। এ.সি. কাউলে এই প্রশ্নটি ঠিকই তোলেন : অন্যতম মধ্যযুগীয় ইংরেজ কবি Caedmon এবং Cynewulf যা করেছেন বলে জানা যায় এবং পরবর্তীকালে কোলরিজ যা করেন—Pearl এবং অন্য কতিপয় মধ্যযুগীয় ইংরেজ কবির বেলাতেও কি সেটাই সত্য? "কবি কোলরিজ ঘুমের ওযুধ খেয়ে শোবার আগে 'পারচ্যাস হিজ পিলগ্রিমেজ' বইটি নিয়ে পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু, ঠিক ঘুমোবার আগেই তিনি পড়ছিলেন— 'Here the Khan Kubla commanded a palace to be built and a stately garden there unto. And thus ten miles of fertile garden were enclosed with a wall,'—কবি স্বপ্নঘোরে কুবলা খানের প্রাসাদ, উদ্যান, উর্বর ভূমি, ইত্যাদি একান্ত স্পষ্টভাবে দেখেছেন এবং স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দু-তিন শ' ছত্র রচনা

করেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা জাগ্রত অবস্থায় চুয়ান্ন লাইনের বেশি লেখা সম্ভবপর হয় নি।" তাই, কাব্যটি অসমাপ্ত বলে বলা হয়। আর এল স্টিভেনসন তো নিজের কথা নিজেই বলেছেন যে, স্বপ্নস্মৃতির ভাণ্ডারকে তিনি নিয়মিত ব্যবহার করতেন। অনেক প্লটই নাকি তিনি স্বপ্ন থেকে নিয়েছেন, এবং প্রকাশকরা গল্পের জন্যে অধিক তাগাদা দিলে তিনি নাকি তখন স্বপ্নের শরণাপন্ন হতেন, তিনি নাকি কিস্তিতেও (instalment) স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল স্বপ্ন (creative dream) বলতে যে ধারণাটির কথা একালে অনেকেই বলেছেন, তা বোধ হয় ঠিক স্টিভেনসনের স্বপ্নমতন ব্যাপারই, যা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল তাঁর মস্তিস্কের তপ্ত–তৎপরতা (perfervid working), ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। এফ. টি. মিখাইলভ যেমন তাঁর *দ' রিডল অব দ' সেল্ফ*–বইয়ে নিজের একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় লেখা কোনো গল্পের তুলনায় তা কম কিছু সাহিত্য–সৃষ্টি নয়। প্রশ্ন করেছেন তিনি, স্বপ্ন–অভিজ্ঞতার তাৎপর্য তাহলে জাগ্রত জীবনের চেয়ে কোন্ অংশে কম? এবং, মধ্যযুগীয় ও অধিকাংশ অন্য কবি–লেখকদের বেলায় স্বপ্নের ব্যবহার যেখানে ছিল প্রচলন–প্রথা কিংবা কৌশলের প্রয়োগ মাত্র, *পার্ল*–কবির বেলায় তা একটু অন্যরকম হতেও পারে, সম্পূর্ণ অসম্ভব নয় যে প্রয়াত সন্তানকে তিনি স্বপ্নে একটি স্বর্গদৃশ্যে দেখেছেনই, কবির বাইবেল–জ্ঞান, সংবেদনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি পূরণ করেছে বাকি প্রয়োজন। ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াকোভস্কি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উপমা খুঁজে পান। অতি প্রচলিত নয় এমন একটি শব্দবন্ধ খুঁজছিলেন মায়াকোভস্কি–প্রেমিকার পর্যাপ্ত মূল্য দিতে তিনি তাকে 'নয়নমনি' বলবেন না নিশ্চয়! সমস্যাটি নিয়ে মায়াকোভস্কি ঘুমোতে গেলেন, এবং হঠাৎ স্বপ্নঘোরেই শুনতে পেলেন কথাগুলো, "As a war-hacked soldier without help or home, cares for his only leg",। সম্ভাব্য সব শব্দ ব্যবহার করেও কোনো যন্ত্র তো এই গ্রন্থনা সাধন করতে পারবে না, কবির মহৎ এবং আতুর হৃদয়ই, স্বপ্নাবস্থায়, প্রজ্জ্বলন্ত অনুভূতিকে কবিতার অমন একটি লাইনে রূপায়িত করতে পেরেছে। মেণ্ডেলেয়ভও নাকি বহু চেষ্টার পর তাঁর সেই মৌলকণা-বিন্যাসের

টেবিল স্বপ্নেই দেখতে পেয়েছিলেন। Friedrich A. Kekule (ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক) এবং Dr. Herman U. Hilprecht (পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)-এর বেলায়ও মেণ্ডেলেয়ভের মতোই ঘটেছিল। এ সব ঘটনা কি শুধু যোগাযোগের কাকতালীয় ব্যাপার, নাকি স্বপ্নও একটি পূর্ণাঙ্গ মননক্রিয়া? আমাদের জীবনের সামগ্রিক সৃজনশীলতার অংশ? বার্টাণ্ড রাসেল কি অকারণেই বলেছিলেন, স্বপ্নও একটি জীবন, অন্য প্রতিটি ব্যক্তিজীবনের মতো যা জন্ম নেয় এবং মৃত্যুবরণ করে? হতেও তো পারে যে স্বপ্ন শুধু স্মৃতি নয়, অতীত রূপকল্পসমূহের সম্মেলন নয়; যুক্তিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের সীমা পেরিয়ে স্বপ্নে আমাদের মস্তিস্ক যে পরিস্থিতি, মেজাজ এবং চরিত্রদের সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে একাংশ হয়তো সম্পূর্ণ নূতন, নূতন ধারণা, নূতন সঙ্গীত, নূতন কবিতা।

মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা, 'পীয়ারস্ প্লাউম্যান' স্বপ্নের আর একটি দিককে, এর সিনেমা-চরিত্রটিকে, স্পষ্ট করে তুলেছে। চিত্রনাট্যের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে, অর্থাৎ বিশাল-বিশাল বিবরণকে চলচ্চিত্রতুল্য ছবি ও শব্দের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলায় হয়তো এ-কবিতার কবি ল্যাংল্যাণ্ড ব্যর্থ হন। যেমন, প্রথম স্বপ্নেই কবি দেখেন একজন শ্রমক্লান্ত কৃষক সেই খাদ্য উৎপাদনের কাজেই ঘর্মাক্ত হচ্ছে, 'পেটুকরা যার অপচয় ঘটাবে।' এখন প্রশ্ন হলো, কি করে কেউ কাজ এবং তার ফলাফলকে একই সঙ্গে দেখতে পাবে—ফলাফল তো কেবল কিছু পরেই আসতে পারে—এই সময়-ব্যবধানটা স্পষ্ট করে তোলার জন্য ল্যাংল্যাণ্ডের কোনো মনোযোগই থাকে না, তিনি কিছুই করেন না। আবার লেখা হয় "অন্যরা বেছে নিল ব্যবসায়ের জীবন, ছিল অনেক বেশি সুখে কারণ আমাদের সাদা চোখে ওরকম মানুষই উন্নতি করতে পারে।" এখন এই 'কারণ'-কে কি করে মানুষ স্বপ্নে দেখে? স্বপ্ন-মাধ্যমটির বিভিন্ন দিককে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেয়ার মতো ধৈর্য ল্যাংল্যাণ্ডের ছিল না, যা মুখে এসেছে স্বপ্নের মধ্যেও তাই বলেছেন। কখনো এত দীর্ঘ সময়কে চেপে ঠেসে পুরে দেয়া হয়েছে—যা বিশ্বাসের অযোগ্য করে তোলে বিবরণটিকে। 'একাদশ পাসাস'-এ স্বপ্নদ্রষ্টা ভাগ্যদেবীর সাক্ষাৎ পান এবং পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ তাকে অনুসরণ করেন। সময়ের এত বেশি

ঘনীভবন (condensation) স্বপ্ন–কারিগরিতেও বোধ করি অচল। তবে, এত বেশি ছবি, রূপকল্প, দৃশ্য এবং পরিস্থিতি এই কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে আসতে থাকে যে, তাড়াহুড়ো এবং অমনোযোগের সব ক্রুটি সত্ত্বেও মধ্যযুগের স্বপ্নকাব্যে অর্ধ–সম্পাদিত এবং ক্ষ্যাপামোর সাথে পরিকল্পিত চলচ্চিত্র বলতেও যদি কিছু থেকে থাকে—তা হচ্ছে ল্যাংল্যাণ্ডের 'পীয়ারস প্লাউম্যান'।

অধ্যাপক আহসানুল হক পরিষ্কারই বলেছেন যে, চসারতুল্য স্বপ্নসাহিত্য–রচয়িতার লেখায়ও স্বপ্নমনস্তত্ত্বের ব্যবহার যে পরবর্তীতে ক্রমশ কমে আসতে থাকে, তার কারণ অন্য কিছু নয়, মধ্যযুগীয় স্বপ্নবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এ–বিজ্ঞান তখনও পরীক্ষা–নিরীক্ষার ভিত্তিতে খুব একটা অগ্রসর হয় নি। সে-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, অধ্যাপক হকের অভিমতও কার্যত আমাদের প্রাথমিক সেই বক্তব্যের পক্ষেই দাঁড়ায় যে, স্বপ্নসাহিত্য সমসাময়িক ও স্থানীয় স্বপ্নভাবনা ও স্বপ্নবিজ্ঞানকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। মধ্যযুগে একাংশ ছিল দৈবী উৎসের স্বপ্নের ধারণা, অপরাংশ শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ থেকে সৃষ্ট স্বপ্নের ধারণা। দ্বিতীয় অংশের বেলায় তখনও দুরূহ জটিলতা, গভীর প্রভাব এবং দূর আন্তঃসম্পর্কের মতন মূলত ফ্রয়েডীয় বলে চিহ্নিত পরবর্তীকালের ধ্যান–ধারণার সৃষ্টি হয় নি। যেটি বেশি ছিল সেটি হচ্ছে এই অভিমত যে, জাগ্রত অবস্থার ব্যাপারগুলোই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। যেমন, 'The Parlement of Foules' কবিতায় চসার লেখেন :

The juge dremeth how his plees been sped ;
The cartere dremeth how his carte gon ;
The riches of gold, the knyght fyght with his fon ;

প্রকৃতপক্ষে লুক্রেসিয়াস (Lucretius)–ই এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, "আমাদের আগ্রহের ওপর যে কাজের দাবি সর্বাধিক শক্তিশালী কিংবা যে কাজ আমাদের জাগ্রত সময়কে পূর্ণ করে রেখেছে, যে কাজে মনের নজর নিয়োজিত, সেই কাজই ঘুমের সময়ে আমাদের সর্বাধিক দখল করে রাখে।" লুক্রেসিয়াসের বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে সত্য মনে করার প্রয়োজন নেই,

তবে স্বপ্ন–সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার লক্ষ্যে কার্যকারণ নির্ণয়ের এ–চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

জিওফ্রে চসারের লেখকসত্তা জাগ্রত হয়েছিল বিখ্যাত ফরাসি স্বপ্ন–সাহিত্য *The Romance of the Rose* অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। 'The Parlement of Foules' লেখার জন্যে চসার ম্যাক্রোবিয়াসের *Commentary*–র অন্তর্ভুক্ত Drean of Scipio পড়েছিলেন। সিসেরোর স্বপ্ন–বিষয়ক রচনা *Somnium Scipionos*–এর নামও উল্লেখ্য, কেননা, এই বিখ্যাত স্বপ্ন–সাহিত্যটি ছিল 'The Parlement of Foules'–এর ক্ষেত্রে চসারের প্রত্যক্ষ অনুসরণের স্থল। প্রথম দিককার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *The House of Fame*–এর ক্ষেত্রে চসার অনুসরণ করেছিলেন অপর এক ধরনের স্বপ্ন–সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য বলে কীর্তিত *Divine Comedy*–কে। *The Romance of the Rose* ছাড়াও, আর যে সব ফরাসি স্বপ্ন–সাহিত্যকে চসার ইচ্ছেমতো কাজে লাগিয়েছিলেন, তার একটি তালিকার সূত্রে বিশ্বে স্বপ্নসাহিত্যের ভাণ্ডারের একটি অংশকে অন্তত ধারণা করে নেয়া যাবে : Jean de Conde–এর *Li Fablel dou Diéu do Amours*, Nicole de Margival–এর *La Panthere d'Amours*, Jean de Conde–এরই *La Messe des Oisiaus et li Plais des Chanonesses et des Grises Nonains*, Machaut–এর *Le Dit dou Lyon* এবং *Dit dou Vergier*, Foissart–এর *Paradysd*, *Amours*–এর *Le Joli Buisson de Joñece*, Deschamps–এর *Le Lay Amoureux* এবং Lorris–এর *Romain*। এ সব পূর্বতন স্বপ্নসাহিত্যের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা এবং প্রভাবকে আত্মস্থ করার বেলায় চসার যে তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টি এবং যুগসত্যকেই মর্যাদা দিয়েছিলেন, তার আবার প্রমাণ হচ্ছে মহান, স্বর্গীয় এবং বিপুলকে বাদ দিয়ে চসার বেছে নিয়েছিলেন ঘরোয়া এবং পারিবারিক সব বিষয়কে। আর, চসারের বেলায় স্বপ্নের সমসাময়িক জ্ঞান রচনাকর্মের পটভূমিতে বা কাঠামোয় থেকে যায় না মাত্র, বিষয়বস্তুতে পর্যন্ত পরিণত হয়। *The House of Fame*-এর Proem–এ, The Nun's Priest's Tale–এ Pertelote এবং Chaunteeler এর মধ্যকার বিতর্কে এবং *Troilus and*

Criseyde–তে ট্রয়লাসের প্রতি প্যাণ্ডারাসের তিরস্কার ভাষণে স্বপ্নের প্রকৃতি এবং ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যেমন হয়, সেসব আলোচনায় স্বপ্ন-সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় চিন্তার সকল দিক, কারিগরি দিকগুলো পর্যন্ত উঠে আসে। প্যাণ্ডারাস তথা চসারকে দেখা যায়, পুরোহিত এবং চিকিৎসকদের স্বপ্নভাবনার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করেছেন। প্যাণ্ডারাস বুঝি ছিলেন ক্যাটোর (Cato) প্রতিনিধি (যে ক্যাটো বলেছিলেন, 'স্বপ্নকে পাত্তা দিও না।' Pay no heed to dreams')। স্বপ্নের মূল্যে সন্দেহ ছিল তাঁর, পাখিদের কাছ থেকে পাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসকে তুলনা করেছেন তিনি পচা লৌকিক কুসংস্কারের সাথে। প্রমাণ হয় যে Galen. Averroes, Avicenna, Petrus de Abano, Albohazen Haly filius Abenragel, Arnoldus Rhazes de Villa Nova, Vincent de Beauvais, St. Augustine এবং Cornelius Agrippa–র মতো বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষ, চিকিৎসক, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তার স্বপ্নচিন্তা সম্পর্কেও চসার ভালই অবহিত ছিলেন। (প্রসঙ্গক্রমে স্বপ্নবেত্তা হিসেবে এঁদের পরিচয় আমাদের কাছে পৌঁছয়।) 'দ' নান'স প্রিস্ট'স টেল–'এ Dame Pertelote (choler, melancholy–র তুল্য Humour এবং complexions–এর মতন) শারীরিক কারণে উদ্ভূত স্বপ্ন সম্পর্কে এত খুটিনাটি ও সঠিক বলেন যে, আবু সিনাহ্‌র 'ধুম্র-উদগীরণ' (Fumosity)–তত্ত্ব আমাদের মনে পড়ে যায় : "বাস্তব কারণ হচ্ছে এক ধরনের বাষ্প, নিম্নতর প্রত্যঙ্গ (member) থেকে যা মস্তিষ্কে পৌঁছয়। পরিপাক হচ্ছে এমন খাদ্য এবং শারীরিক উপাদান (humour) থেকে উদ্‌গীরণই হচ্ছে এই বাষ্প। যখন এটা এর ঊর্ধ্বগমনের শেষ সীমায় পৌঁছয়, মস্তিষ্কের শীতলতার কারণে এটা আরো ঘন হয়, চাঞ্চল্য হারায়, এবং অন্যান্য আর্দ্রতা থেকে বর্দ্ধিত ওজন আহরণ করে।"[১] আবু সিনাহ্‌র এই মতের মধ্যে স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় কারণ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কল্পনার বিপরীত যে যুক্তি, তারই বার্তা নিয়ে যখন রেনেসাঁ এল, তখন যে স্বপ্ন–সম্পর্কিত ধ্যান–ধারণা একটু পাল্টে যাবে, সেতো খুবই স্বাভাবিক। স্পেন্সারের 'ফেইরী কুইন' স্বপ্নে দেখা পরী রাণীকে রাজা আর্থারের খুঁজে ফেরার কাহিনী, গোটা কবিতায়ই এক স্বপ্নিল পরিবেশ ;

সেক্সপীয়রের বহু নাটকেও স্বপ্নের আনাগোনা, *জুলিয়াস সিজার*–এ কালপুর্নিয়ার স্বপ্নে অনাগত ঘটনার আভাস, লেডী ম্যাকবেথ তো একজন প্রকৃত স্বপ্নাচারী (somnumbulist); *এ মিডসামার নাইট'স ড্রিম*–এর গোটা পরিবেশ স্বপ্নে ঘেরা। এলিজাবেথীয় এবং জ্যাকোবীয় নাট্যকারদের রচনায় এক বড় উপাদান এই স্বপ্ন, কিন্তু তত্ত্বহীন। ইংরেজি সাহিত্যের বেলায় সত্য এ–ই যে, প্রথম রোমান্টিক কালপর্বের অবসানের সাথে-সাথে স্বপ্নের প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। অগাস্টান যুগের প্রধান কবি আলেক্সাণ্ডার পোপ স্বপ্ন নিয়ে রীতিমতো ঠাট্টাবিদ্রূপে মেতেছিলেন—স্বপ্নে বিশ্বাস করে নাকি শুধু শিশু ও মেয়েরা, বিদ্রূপের পাত্রী বেলিণ্ডাই 'রেপ অব দ' লক'–এ স্বপ্ন দেখে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনই আবার ইংরেজি সাহিত্যে স্বপ্নকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। রোমান্টিক কবিরা—ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস্, বায়রণ সকলেই কোনো না কোনো ধরনের স্বপ্নদ্রষ্টা। চারদিককার সবকিছু দেখেশুনে ওয়ার্ডওয়ার্থ বুঝি সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন :

> Whither is fled the visionary gleam?
> Where is it now, the glory and the dream?

'দি এনসিয়েন্ট ম্যারিনার' এবং 'খ্রীস্টাবেল'–এর পরিবেশও খুবই স্বপ্নাচ্ছন্ন, অপার্থিব। স্মৃতি–হাতড়ানোর এক চেষ্টাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বেশ কটি স্বপ্নদৃশ্যের কথা মনে পড়ে (চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইত্যাদি উপন্যাসে), রহস্যজনকভাবে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদটি শুরু হয় বায়রণের কবিতার এমন একটি পংক্তিযোগে যা নাকি স্বপ্নেরও সত্য-সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে : I had a dream, which was not all a dream। একটি অনন্য প্রশ্ন রয়েছে অবশ্য কীটসের কবিতায়ও, 'ওড টু নাইটিঙ্গেল'–এর শেষে কবি নিজেকেই নিজের রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেন—Was it a vision or a waking dream?

একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়, স্বপ্নলোক এবং কল্পলোকের মধ্যে নিয়ম–নীতি এবং বাস্তবতার ঊর্ধ্বে এক অবাধ স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রচণ্ড মিল থাকায়

সাহিত্য বিষয়বস্তু কিংবা আঙ্গিক হিসেবে অন্তত, স্বপ্নকে সর্বদাই ব্যবহার করেছে। মার্কেজের ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজমের ধারণাটি থেকেও বোঝা যাবে যে বিপরীত ইঙ্গিতে নিরেট বাস্তবতার সার্থক ও মনোহারী প্রকাশেও স্বপ্নের কাঠামো খুবই সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আর, সত্য অর্থে স্বপ্নদর্শনের প্রত্যয়টি তো আমাদের জানাই রয়েছে। সুতরাং, নিদেন কাঠামো বা আবহ হিসেবে স্বপ্ন রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের গোটা এলাকা জুড়েই, এর বাস্তববাদী অংশেও। আধ্যাত্মিকতা-প্রেষিত এবং রোমান্টিকতাশ্রয়ী সাহিত্যে স্বপ্ন মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রোমান্টিক পুনরুজ্জীবন-পর্বের ইংরেজি সাহিত্যের স্বপ্ন সম্পর্কে একটি বৈশিষ্ট্য এখানে নির্দেশ করা দরকার—ফিরে আসার বেলায় সে তার ইতঃপূর্বেকার আধ্যাত্মিকতার অংশ ছাটাই করে এসেছে। অর্থাৎ, এখানে এসে দৈবী রোমান্টিকতার এবং প্রকৃতপক্ষে দৈবী উৎসের স্বপ্নের যুগ অবশেষে শেষ হয়েছে। সমাজবিকাশের অগ্রগতির যুক্তিও সেটাই দাবি করে।

দেশ এবং সাহিত্যভেদেও একই কথা সত্য। মঙ্গলকাব্যে যেমন দৈবী উৎসের স্বপ্ন ও রোমান্টিকতা ছিল, পরবর্তী সময়ে, রবীন্দ্রনাথের কালে আর তা তেমনটা নেই। এ সম্পর্কে ড. অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিষ্কার অভিমত : "ঠিক ভৌতিক অতিপ্রাকৃতকে বিষয় করে রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্য রচনা করেন নি, এটা বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা চলে...তবে একটি মাত্র কবিতায়...অতিপ্রাকৃত পরিবেশের বর্ণনা আছে, কিন্তু মূলতঃ কাব্যটি অতিপ্রাকৃত নয়। সেটি হোল 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি। এটি 'চিত্রা'র শেষ কবিতা ও রচিত হয়েছে ২০ ফাল্গুন ১৩০২ (১৮৯৫) এবং এরপর কবি সুদীর্ঘকাল এ ধরনের অতিপ্রাকৃত পরিবেশও সৃষ্টি করেন নি। তাঁর এ রচনায় যেন একটি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই স্বপ্নলোকের মায়াজাল কবি নিজ হাতেই ছিন্ন করে দিয়েছেন।"

রোমান্টিক যুগ শেষ হলে ইংরেজি সাহিত্যের অংশ হিসেবে স্বপ্নের ভূমিকায় স্বাভাবিক একটি বিরতি আসে। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড-ইয়ুং-এ্যাডলারের ধারণাগুলোর তোলপাড়-সৃষ্টিকারী প্রভাবে, স্বপ্ন পুনরায় তার মধ্যযুগীয় তথা স্বর্ণযুগীয় মর্যাদায় সাহিত্যে প্রত্যাবর্তন করে। পাশ্চাত্যের

প্রধান সাহিত্য–আন্দোলনসমূহ স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েড ও তার অনুসারীদের অভিমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে থাকে। সমসাময়িক স্বপ্নজ্ঞানকেই লেখক–কবিগণ তাদের সৃষ্টিকর্মের একাংশের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তারই ফলে, স্ট্রীম অব কনসাসনেস–এর মতন, সুররিয়ালিজম, ডাডাইজমের মতন সাহিত্য–মতবাদ, সাহিত্য আন্দোলন ফ্রয়েডীয় ধারার স্বপ্নচিন্তায় পুষ্ট হতে থাকে। এ্যাবসার্ড থিয়েটার, সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট, নিও সুররিয়ালিজম, কন্‌ফেকশনাল স্কুল, এমন কি বিটগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মও স্বপ্নতত্ত্ব প্রভাবিত ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণের প্রতিচ্ছায়া। পাশ্চাত্যের এসব আন্দোলন ও স্কুলের ঢেউ এসে পৌছায় বিশ্বের বাকি দেশগুলোর সাহিত্যেও, বাংলা সাহিত্যেও। এর একাংশ যান্ত্রিক কিংবা অন্ধ অনুকরণ, বাকিটা যুগ–ধারণার স্বাভাবিক সংক্রমণ।

প্রকৃতপক্ষে, বহির্বাস্তব–সমাজবাস্তবের রূঢ় দৃশ্যপটে পীড়িত-প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক যুগের এক দল কবি যখন এক অদ্ভুত যোগাযোগে মনোসমীক্ষণেরও জটিল সব ধারণার সন্ধান পেয়ে যান, তখন যে সে দলে যাঁকে একজন লেট–রোমান্টিক বলা হয়, সেই ইয়েটসও ভিড়বেন, তিনিও 'অটোমেটিক রাইটিং' এর দিকে ঝুঁকবেন, তাতে আর বিস্ময় কি ! 'নিও ক্লাসিসিস্ট' বলে সুবিদিত, Impersonal Theory of Poetry–র প্রবক্তা এলিয়টের বেলায়ও তা–ই ঘটবে। বাস্তবতার পটভূমি সরে গেলে, তাঁর চোখেও পড়বে 'some rude unknown psychic material that directs the poet.'

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুসারীগণ

১৮৫০-এর দশকে বস্তুবাদী ধারার স্বপ্নব্যাখ্যায় একটি মাইলফলক যোগ করেন ফরাসি চিকিৎসক আলফ্রেড মাউরি (Alfred Maury)। তিন হাজার স্বপ্ন-বিবরণ পরীক্ষা করে মাউরি বলেন, স্বপ্ন জন্ম নেয় বাস্তব বহিঃপ্রভাবে, সদ্যসৃষ্ট ছাপ-দাগকে ভিত্তি করে। তিনি লিখেছিলেন, "একবার তাঁর বিছানার একাংশ তাঁর ঘাড়ের পেছনে হেলে পড়ে এবং তাকে জাগায়। রেখে যায় স্বপ্নস্মৃতি যে তাঁকে আনা হয়েছে একটি ফরাসি বিপ্লবী আদালতের সম্মুখে, জেরা করা হয়েছে, দণ্ডিতও, এবং এক পর্যায়ে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছে, জল্লাদ তাকে বেঁধেছে, এবং ঝপাং করে গিলোটিনের ফলাটি পড়েছে তার ঘাড়ে।"

১৮৫০-এর দশকেই (১৮৫৬ সালে) জন্ম নিয়েছিলেন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ইতিহাসের আর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, সিগমাণ্ড ফ্রয়েড। এই ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুসারীগণ একাংশে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন, কিন্তু অপরাংশে কিংবা বলা যেতে পারে শেষ-বিচারে, তাঁরাও ভাববাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। ফ্রয়েডের ভাববাদী চিন্তাংশ স্মরণ করিয়ে দেয় 'প্রবীণ প্রাচীন সন্যাসী' প্লেটোকেই, যিনি বলেছিলেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটে আত্মার রহস্য উন্মোচন, শাশ্বত সনাতন সত্যের পরম অভিব্যক্তি। প্লেটোর আত্মা ফ্রয়েডে এসে ইচ্ছেয় রূপান্তরিত হয়। ফ্রয়েডে এসে স্বপ্ন সম্পর্কিত অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা দুর্বল হয় এতটুকুই যে, বলা হয়, স্বপ্নমাত্রেরই নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং লৌকিক কারণ থাকতে বাধ্য। এবং কার্যকারণবাদী বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি ফ্রয়েডধারাকে এনে স্বপ্ন-সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার এবং অদৃশ্য আর অলৌকিক শক্তির ধারণার বিরুদ্ধে

দাঁড় করায়। তবে, এক ধরনের সমীক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করলেও, নির্জ্ঞান-ধারণা, অবাধ অনুষঙ্গ, এবং বাড়াবাড়ি রকমের প্রতীকবাদের মতন চেতনা ও যুক্তি-বিরোধী বক্তব্যের কারণে, উনবিংশ শতাব্দীর জাতক হয়েও ফ্রয়েড পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন সেইসকল বস্তুবাদী স্বপ্নবেত্তা থেকেও পিছিয়ে রইলেন, যাঁরা (বাস্তবঘেঁষা ও সাহসী) অনুমানের ভিত্তিতে হলেও (গবেষণালব্ধ তথ্য প্রমাণের সুযোগ তখন ছিলনা) স্বপ্নের কারণ হিসেবে বহির্জাত ও অন্তর্জাত উদ্দীপকের ধারণা পর্যন্তও পৌঁছে গিয়েছিলেন।

স্বপ্নকে সিগমাণ্ড ফ্রয়েড ভুলচুক, হিস্টিরিয়া ইত্যাদির মতো মনোসমীক্ষণের অনেক মাধ্যমের একটি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সামগ্রিক এক নির্জ্ঞানের, অর্থাৎ মনের এক গোপন স্তরের ধারণায় পৌঁছেছিলেন ফ্রয়েড ১৮৯৫ সালে। স্বপ্নও নাকি এই নির্জ্ঞান রাজ্যের খবরাদি এনে দিতে পারে, এবং মনোবিকলন (neurosis), ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে। ফ্রয়েডের স্বপ্ন ভাবনার শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই তত্ত্ব যে, কোনো মনোবিকলনের রোগীর শারীরিক উপসর্গগুলোর বিশেষ কোনো মানসিক (psychic) উৎস থাকতে পারে। দৈহিক উপসর্গের (clinical) সমস্যার সমাধান মনোস্তাত্ত্বিক (psychological) পদ্ধতিতে খুঁজেছিলেন ফ্রয়েড। অবহেলিত মনোজগৎ ফ্রয়েডের দৃষ্টি কেড়েছিল।

একুশ বছরের মেয়ে এ্যানা তার অবশ ডান হাত, আচ্ছন্ন দৃষ্টি, খাদ্যবস্তু গেলার অসুবিধে এবং এরূপ আরো কিছু বিভ্রান্তিকর লক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ভিয়েনার ডাক্তার জোসেফ ব্রিউয়েআরের কাছে। এই হিস্টিরিয়া রোগিনীর চিকিৎসায় ফ্রয়েড (ফ্রয়েড তখন ব্রিউয়েআরের সহকারী) এবং ব্রিউয়েআরের ছিল ক্যাথারসিসের কিংবা 'কথা বলানোর মাধ্যমে আরোগ্য-সাধনের' এক পদ্ধতি। সম্মোহন পদ্ধতিতে এই কথা বলানো হয়েছিল। তাতে জানা গিয়েছিল যে এ্যানার ডান হাত অবশ হয়েছিল চেয়ারের পিঠের ওপর দিয়ে হাতটি ঝুলিয়ে রাখার কারণে শুধু নয়, এ্যানা স্বপ্নে একটি সাপ দেখে ভয় পেয়েছিল, যে-সাপকে তাড়ানোর চেষ্টা তার অসহায়ত্ব বাড়িয়েছিল, একই উদ্বেগ তার কথা বলার ক্ষমতাও কেড়ে নেয়। বাল্যকালে এক গভর্নেস একটি পারিবারিক গ্লাস থেকে একটি পোষা

কুকুরকে কিছু একটা পান করিয়েছিল, সম্মোহন পদ্ধতিতে সেই স্মৃতি জাগ্রত করে এও জানা গেল যে গভর্নেসকে এবং তার ওই কাজটিকে এ্যানা খুব খারাপ ভেবেছিল। সম্মোহনে এই কাহিনী বলার পর অবশ্য এ্যানার আর জল পানের কোনো অসুবিধেও থাকল্যে না। বাল্যস্মৃতি অবচেতনে, কিংবা বলা যায় নির্জ্ঞানে, কিরূপ জমাট সঞ্চিত থাকে, এভাবে তা প্রমাণ হলো। ফ্রয়েড পরে বলেন, স্বপ্নেও এই বাল্যকালে সঞ্চিত কামনা, হিংসা,আগ্রাসী মনোভাব, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এও নাকি প্রমাণ হলো যে বলতে পারার মোচনকারী (cathartic) প্রভাবেই বিরূপ ভাবটি কিংবা অনিচ্ছার অবসান হয়। এসব চিকিৎসা-প্রচেষ্টার যোগফলে এই তত্ত্ব দাঁড়ালো যে স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব বৈকল্যের অতীত, এমনকি বাল্যকালাবধি বিস্তৃত, উৎস-কারণ জানা থাকে না, যোগাযোগগুলো সময়ে ও সম্পর্কে দূরে চলে যায়, সম্মোহন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে সেই অবচেতনে কিংবা পূর্ণ নির্জ্ঞানে পৌঁছা গেলে, উৎসের কারণের বিবরণ শোনা গেলে, সেই জ্ঞানার্জনের সূত্রে, মূল বৈকল্যই দূর হয়। (এটা হেগেল-ফয়েরবাখের cognitive act–এর ভাববাদী তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।) আর, ফ্রয়েডের মতে হিস্টিরিয়া কিংবা অন্যপ্রকার মনোবিকলন হচ্ছে সামাজিক চাপের মুখে, প্রচলিত নীতিবোধের চাপে অবদমিত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছারই-অসুস্থতা সৃষ্টিকারী প্রকাশ, অবদমিত কোনো ইচ্ছার রোগের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণের প্রমাণ, ফললক্ষণ। ফ্রয়েড অপূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশপ্রাপ্তির অন্য মাধ্যম-পথও খুঁজে চলেছিলেন, এবং স্বপ্নের মধ্যে তাঁর সেই অনুসন্ধানের একটি বস্তু পেয়ে যান। সচেতন নিয়ন্ত্রণের চাপ পেরিয়ে অবচেতন আর নির্জ্ঞান নাকি এসে স্বপ্নের মধ্যেও প্রকাশ পায়, রূপ লাভ করে। পূর্বোল্লিখিত সামাজিক প্রয়োজন, নীতিবো,ধ ইত্যাদির আকারে যা আমাদের আবাল্য ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রাসী মনোভাবকে পর্যন্ত দমন করে রাখে, ফ্রয়েড তাকে বললেন 'সেন্সর', প্রহরী-সংজ্ঞান। মনোলোকের এই প্রহরী তার সতর্ক দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে কখন? ঘুমঘোরে। ঘুমঘোরেই তাই স্বপ্ন দেখা এবং 'ফ্রয়েডীয় ইচ্ছে' গুলো পূর্ণ করে নেয়া। স্বপ্ন হচ্ছে ইচ্ছেপূরণের মধ্যে অবচেতনের মুক্তি। এমনও বলা হয়েছে, রূপকথার পরীর মতন স্বপ্ন ইচ্ছে–

পূরণের আয়োজন করে, উপস্থিত করে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ইত্যাদি। এবং ফ্রয়েডের মতে রূপকথা নাকি বর্ণিত লোকস্বপ্ন, আর পুরাণ হচ্ছে জাতিগত স্বপ্নভাবনা। একটা দ্বন্দ্ব শুধু থেকে যায় : স্বাভাবিক ইচ্ছাপ্রবৃত্তির চাপে মানুষ স্বপ্ন দেখে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক নীতিবোধের চাপে স্বপ্নে আবার সেই ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষারও একরূপ রূপান্তর ঘটে, তাকে একরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। এই রূপান্তরণ ও ছদ্মবেশ ধারণের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাত্রান্তরণ, অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি, স্থান কিংবা ঘটনায় সরে যাওয়া, সংক্ষেপকরণ, অর্থাৎ দীর্ঘকালকে স্বল্পকালে, বড় ঘটনাকে ছোট ঘটনায় পরিণত করা, ইত্যাদি পদ্ধতি। যেমন, একটি ইডিপাস গূঢ়ৈষাকে নাকি তখনও চিনে নিতে হবে, যখন কোনো যুবক স্বপ্ন দেখবে যে সে একজন বৃদ্ধ ব্যাংকারকে গুলি করে টাকা নিয়ে পালাচ্ছে। এ ছাড়া থাকে বস্তু বা ঘটনাকে তথা ছবিকে স্বপ্নের ভাষা হিসেবে গভীর অর্থপূর্ণ করে তোলা অর্থাৎ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা। স্বপ্নের দাঁড়ায় একটি প্রতীক ভাষা।

ইচ্ছে-অবদমনের আবার রকমফের রয়েছে। নীতিজ্ঞান ও সামাজিক বুদ্ধির যুক্তিতে কিছু ইচ্ছেকে কখনো চেপে রাখা হয়, যারা এসে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে, বিব্রত করে। কখনো-কখনো তেমন অচল ইচ্ছেকে পুরোপুরিই দমন করা হয়, তখন তারা আর স্বরূপে বেড়িয়ে আসার সাহস করে না, গ্রহণ করে উপরোল্লিখিত ছদ্মবেশ, প্রতীকী ভাষা। তৃতীয় যে ধরনের কামনা-বাসনার কথা ফ্রয়েড বলেছেন, তারা নাকি মাতাপিতার প্রতি শৈশবের কামেচ্ছার প্রকাশ, ইডিপাস–গূঢ়ৈষা, ইলেক্ট্রা–গূঢ়ৈষা, ইত্যাদি, শুরু থেকেই এরা নির্জ্ঞান রাজ্যের বস্তু। উল্লেখ করা দরকার যে, ফ্রয়েডের মতে মানুষের সকল সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছেই যৌন তাড়নার সাথে সম্পর্কিত। এই যৌনতামূলক প্রবৃত্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন 'লিবিডো' কিংবা 'ইড' ; এর বিরুদ্ধে থাকে ব্যক্তিগত বিচারবিবেক, ফ্রয়েড তাকে বলেছেন সুপারইগো, অন্ধ যৌন বাসনাকে যা রুখে দিতে চায়। আর এই ইড কিংবা লিবিডো এবং সুপারইগোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিবাদ মীমাংসা করে ইগো, সেন্সর বা প্রহরা বসায় সে। তবে, ঘুমের মধ্যেও ফ্রয়েডের "ইগো" বা 'সেন্সর' তার প্রহরা শিথিল করে আনে মাত্র, তার প্রহরার চাপ কমে গিয়েও থেকে যায়। কিংবা

বলা যায়, নির্জ্ঞান রাজ্যের অবদমিত ইচ্ছের গতিপথ তখন মুক্ত করে দেয়া হয়, কিন্তু বজায় রাখা হয় একপ্রকার সমালোচনার মনোভাব, আর, সে-কারণেই পূর্বোল্লিখিত ছদ্মবেশ বা প্রতীকের দরকার হয়। কামেচ্ছারা ফলে অবিকল বা স্বরূপে বেরিয়ে আসতে পারে না, স্বপ্নের মধ্যে তাদের যে বাহ্যিক চেহারা প্রকাশ পায়, ফ্রয়েড তাকে বলেছেন প্রকাশ্যরূপ স্বপ্ন (manifest dream content)। সেই প্রকাশ্য চেহারা থেকে বিশ্লেষণের (analysis) পদ্ধতিতে খুঁজে নিতে হয় স্বপ্নের মধ্যকার মূল তথা প্রছন্ন ইচ্ছের মর্ম (latent dream content)। প্রকাশ্য–রূপ স্বপ্ন শুধু যে বস্তু প্রতীকের ভাষা গ্রহণ করে, তা নয়, অতিসংক্ষিপ্ত কিংবা অগোছালো ঘটনার আকারেও তারা আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রয়েডের ভাষ্যে দু–একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনলে তার জটিল স্বপ্নতত্ত্ব আরো ভালো বোঝা যাবে, তার প্রতীকার্থ মেনে নিলে প্রতিটি স্বপ্নের গূঢ় মর্মের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে যৌন প্রবৃত্তি বা অনুরূপ বাসনা–কামনাও। ফ্রয়েডের স্বপ্ন ব্যাখ্যার একটি অনূদিত–ভাষ্য তাহলে শোনা যাক :

"এক অবিবাহিত তরুণী স্বপ্ন দেখলেন তার ছোট এক ভাইপো কফিনে শুয়ে আছে। ছোট ভাইপোটিকে তরুণী খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কেন এ স্বপ্ন তিনি দেখলেন। ভাইপোটির মৃত্যু কি তার নির্জ্ঞান মনের কামনা? কেন? এই মেয়েটি এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাদের মাঝে ঝগড়া হয় ও ফলে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। কিছুদিন আগে আর এক ভাইপোর (যার মৃত্যুস্বপ্ন দেখেছেন, তারই বড় ভাই) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ডাক্তার প্রেমিকের সঙ্গে সহসা দেখা হয়। এই দেখা তার মনে আনন্দের শিহরণ এনেছিল। ফ্রয়েড এসব খবর জানতেন। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে স্বপ্নটিতে ডাক্তার প্রেমিককে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে। তরুণীটি আশা করেছেন ছোট ভাইপোটির কফিনের পাশেও প্রেমিককে দেখা যাবে ও তার মনে আনন্দের বান ডাকবে। এই স্বপ্নটির উল্লেখ করে ম্যাকডুগাল...... বলেছেন : হ্যাঁ, ব্যাখ্যা হয়তো সঠিক, কিন্তু ফ্রয়েডীয় ফরমুলার সঙ্গে মেলে না। স্বপ্নটি একটি ইচ্ছার প্রকাশ, সে ইচ্ছাকে (প্রেমিকের সঙ্গে মিলন) কামেচ্ছাও বলা যেতে পারে। কিন্তু, ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক কালের যৌবনের ইচ্ছা। ফ্রয়েডের

মতে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা ও আসক্তিই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত ইচ্ছাটিকে অবচেতন মনের ইচ্ছা বলা চলে কি? তরুণীটি প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছাকে চেপে রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু, অবদমিত করে নির্জ্ঞান রাজ্যে নির্বাসিত করেন নি নিশ্চয়। তা হলে ফ্রয়েডকে অত কথা বলতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডুগাল আবার বলেছেন—কিন্তু খাঁটি ফ্রয়েডিয়ান মাথা নেড়ে নিশ্চয়ই বলবেন, "লোকটা বুঝতে পারছে না যে ভাইপোর মৃত্যুকামনা শৈশবের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুকামনার সামিল। সে ইচ্ছাটা এখন পুরাপুরি অবচেতনায়।" তরুণীটির ছোট ভাই ছিল না বলছ? কিছু আসে যায় না। তার ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের মধ্যে কারুর না কারুর ছোট ভাই নিশ্চয়ই ছিল এবং শৈশবে তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ছোট ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করেছে। আর ঐ ডাক্তার প্রেমিকটিতো মেয়েটির শিশু বয়সের প্রেমিক পিতার প্রতিচ্ছবি।" (*পাভলভ পরিচিতি*, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ৬৫–৬৬)।

একটি সংশয় তখন বড় হতে থাকে : ফ্রয়েডের বেলায় তত্ত্ব বুঝি প্রথমে তৈরি হয়েছে, এবং তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্য-যুক্তি পরে সাজানো হয়েছে। স্বপ্নের প্রতীকার্থ নিয়ে যখন নিরাপোস পীড়াপীড়ি হতে থাকে, তখনও একই কথা মনে হয়। অথচ, মূলত এই প্রতীকবাদের ভিত্তিতেই ফ্রয়েড তার লিবিডোতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সমস্ত বস্তু ও ঘটনাই সনাতনভাবে একটি যৌন তাৎপর্য বহন করে—লিবিডোতত্ত্ব সেই কথাই বলে। কিন্তু প্রথম আপত্তিই করা চলে যে, "এমন বহু স্বপ্ন প্রত্যেকেই দেখে থাকেন, যেগুলো মানুষের প্রবল আবেগ-অনুভূতির সঠিক প্রতিচ্ছবি। প্রতীক বা উদ্ভট কল্পনার কোনো অবকাশ সেইসব স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপের মধ্যে একেবারে নেই। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকে। যুদ্ধের সময় সৈনিকরা স্বপ্নের মধ্যে লড়াই করে। উকিলরা বড় মামলার আগে স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় সওয়াল জবাব করে। এসব স্বপ্নে উদ্ভট কল্পনা বা প্রতীকের কোনো বালাই নেই। উপোসী মানুষ ভোজসভার-স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন যে মস্তিষ্কের পরিবর্তিত বিশেষ অবস্থার প্রক্রিয়া, এ সরল সত্য কথাটি অস্বীকার করার অর্থ মস্তিষ্কবিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। আর, ফ্রয়েড

বরাবরই তাই করেছেন। প্রতীকবাদ সমর্থন করে না, এমন অজস্র স্বপ্ন আছে। সেগুলো ফ্রয়েড এড়িয়ে গেছেন। নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ যে স্বপ্নে নেই, সেগুলো বোধ হয় স্বপ্নই নয় (পাভলভ পরিচিতি, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮–৬৯)।

অন্যভাবে বললে, ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব তথা প্রতীকবাদের একটি দাবি দাঁড়ায় এই : "মনদ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সবকিছুরই বাস্তব ও ব্যবহারিক অর্থটা একেবারে অবান্তর। কেননা, সবকিছুরই একটা প্রতীকী অর্থ আছে, আর সেই প্রতীকী অর্থটাই হলো আসল অর্থ।" আর, ফ্রয়েডের প্রতীকগুলো ছিল সব উদ্দেশ্যমাফিক বাছাইকৃত, তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্যেই নির্ধারিত, মনগড়া। স্বপ্নপ্রতীকের কোনো স্থায়ী ছক তার ছিল না, কখন কোন্ প্রতীক ব্যবহার করবেন, তার কোনো যুক্তি, নিশ্চয়তাও নয়। মূলগতভাবে ফ্রয়েডের একজন প্রধান অনুসারী হয়েও ম্যাকডুগাল বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "ফ্রয়েডের স্বপ্ন-প্রতীক এমনভাবে আবিষ্কৃত যে মাত্র তার সাহায্যেই স্বপ্নের ফ্রয়েডানুমোদিত ব্যাখ্যা সম্ভব।" এবং যেটা বলেছি, কামেচ্ছাবর্জিত কোনো বিশ্লেষণ-চিন্তা না থাকায়, ফ্রয়েডের প্রতীকগুলোও সব যৌনাঙ্গ বা যৌনকার্যের প্রতীক। "দুনিয়ার যা কিছু লম্বা শক্ত জিনিস, যেমন ছাতা, লাঠি, পেন্সিল, কলম—সবই পুরুষাঙ্গের প্রতীক। তীক্ষ্ণ ধারালো জিনিস, যেমন ছুরি, ছোরা, বর্শা, তলোয়ার, আঘাত করবার ক্ষমতা আছে যা কিছুর, যেমন বন্দুক, পিস্তল—সবই নির্জ্ঞান-প্ররোচিত পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশ। তুমি যদি স্বপ্নে দেখ (দাঙ্গার সময় অনেকেই যে স্বপ্ন দেখে থাকেন), একজন গুণ্ডা তোমাকে ছোরা বা রিভলবার নিয়ে তাড়া করেছে—তার নির্গলিতার্থ কি হবে বুঝতেই পারছ!... আবার অন্যদিকে, শিশি-বোতল, খানাখন্দ, বাক্স-পেটরা, অলিগলি, গুহা, নৌকা, জাহাজ, ফ্রয়েডের ভাষায় স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক। আপেল, পীচ ইত্যাদির বর্তুলাকার ফল, বুঝতেই পারছ, নারী-বক্ষের প্রতীক। ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্য স্বপ্নে স্ত্রী-অঙ্গ নির্দেশক; আবার জটিল যন্ত্রপাতি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। প্রতীকগুলো আবার সুবিধেমতো অদল-বদল করা যেতে পারে।... কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীকে অর্থ আরোপ করা হয়েছে মনে হয় না।... ফ্রয়েডের মতে লাঙল দিয়ে জমিচাষ ও বীজ–

বপনের উদ্দেশ্য মূলত খাদ্যসংগ্রহ নয়, অবদমিত অজাচার-বৃত্তির তৃপ্তি-সাধন।" (*পাভলভ পরিচিতি*, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ৭০-৭১)

স্বপ্ন-বিশ্লেষণের রীতি-অনুযায়ীও স্বপ্নদ্রষ্টাকে স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবাধে কথা বলতে বলা হয়। আর এটিই হচ্ছে ফ্রয়েডের বিখ্যাত অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "মনে রাখতে হবে, অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে ফ্রয়েডপন্থী যখন রোগীর সমস্ত এলোমেলো কথার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, তখন প্রতিটি কথার বাস্তব অর্থকে সযত্নে বিসর্জন দিয়ে তার প্রতীকী অর্থের দিকে রোগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। আর তাই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় রোগীর মন থেকে বাস্তবকে মুছে ফেলবার চেষ্টা, রোগীকে এক আত্মকেন্দ্রিক ভাবলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।" (ফ্রয়েড প্রসঙ্গে পৃ. ৭৯) ফ্রয়েডবাদ কোন্ অর্থে ভাববাদ, সেটা এইভাবে স্পষ্ট হয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেছেন, "মুক্তির আসল পথ হলো বাস্তবকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারবার পথ। Freedom is the recongnition of necessity। তাই একমাত্র বিজ্ঞানের পথেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি। অথচ ফ্রয়েডপন্থীর পথ হলো বিপরীত পথ—বাস্তবকে ভুলতে শেখবার পথ। ও-পথটা তাই বিজ্ঞানের নয়। ওই পথে এগিয়ে তাই মানসিক গ্লানি থেকে নিস্তার পাবার বাস্তব সম্ভাবনা সত্যিই সঙ্কীর্ণ, যদিও অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ওই পথে এগুলে অনেক সময় মানসিক গ্লানির যন্ত্রণাটা ভোঁতা হয়ে যায়। ... মাদকের মতো।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০)

ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন, প্রতীকী-ভাষা এবং অন্য সব ছদ্মবেশের প্রধান উপযোগিতা এই যে এর ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্নের অন্তর্গত মূল আবেগ ও বিষয়কে কম-বেশি কোনো উদ্বেগ-উত্তেজনা ছাড়া গ্রহণ করা, জেগে-না উঠে ঘুম চালিয়ে যাওয়া এবং তৃতীয়ত একই সাথে ইচ্ছে-পূরণের উপশম অর্জন করা সম্ভব হয়। আর, এই সবকিছুকে একত্রে ফ্রয়েড বলেছেন স্বপ্ন-নির্মাণ বা Dream-work। ইচ্ছে-পূরণের পরেই তাহলে স্বপ্নের গুরুত্বপূর্ণ ফ্রয়েডীয় ভূমিকা হলো ঘুমকে পাহারা-দেয়া, অক্ষত-রাখা।

ফ্রয়েড এও বলেছেন যে ঘুমের সময় মানুষের চিন্তার অবনতি বা সরলতা-প্রাপ্তি ঘটে, আদিম এবং পশ্চাৎমুখী হয় তারা। এবং সেই সুযোগেই অর্থাৎ "সূক্ষ্ম চিন্তার ভাষাগত যন্ত্রাদি"র ব্যবহার বন্ধ-হওয়ার সুযোগেই নাকি অশোভন আর অবদমিত ইচ্ছেরা বেরিয়ে আসতে পায়। এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রতীকের ব্যবহারও নাকি নিদ্রাকালীন সরল চিন্তাভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু প্রতীক-নির্মাণ, পাত্রান্তরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, ছদ্মবেশধারণ, ইত্যাদি কি সরলতর, না উল্টো জটিলতর চিন্তা-প্রক্রিয়ারই পরিচায়ক। এই জটিলতর চিন্তা-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েড তখন বলেছেন আধোঘুমের (partial sleep) সুযোগের কথা।

স্বপ্ন-প্রতীকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সি. এস. হল বিস্তৃত গবেষণা করেছেন, এবং দেখেছেন যে, কোনো একটি স্বপ্নে কয়েকটি দৃশ্য-মাত্র থাকে, স্বপ্নদ্রষ্টাসহ কয়েকটি চরিত্র থাকে এবং পর্যায়ক্রমিক কিছু ঘটনা। হল-এর বক্তব্য হলো যে, এই সবকিছুর জন্যে সরল আঙ্গিকের চিন্তাই যথেষ্ট এই কারণে যে, স্বপ্ন ভাষাভিত্তিক নয়, ছবিভিত্তিক চিন্তা। (যেক্ষেত্রে সাধারণ জাগরণপূর্ণ চিন্তায় ঘটে ধারণা কিংবা প্রত্যয়ের ভাষায় রূপান্তরণ, স্বপ্ন সেই একই ধারণাকে রূপান্তরিত করে দৃশ্য ছবিতে।) এবং ধারণা প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট চিত্রভিত্তিক আঙ্গিক নাকি জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক রূপ, উচ্চ মস্তিষ্কের ওপর যা মোটেই নির্ভরশীল নয়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-প্রতীকের বিরুদ্ধে হল এও বলেছেন যে, দীর্ঘ কোনো স্বপ্নের একাংশ যদি স্পষ্ট যৌন ভাষায় প্রকাশিত, তাহলে বাকি অংশে কেন থাকে প্রতীক? দ্বিতীয়ত ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-প্রতীকের জ্ঞান ছাড়াও, অতি সাধারণ কেউ-কেউও তো, নিজেদের স্বপ্নের যৌন ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেন। হলের শেষ প্রশ্ন এও যে, একই যৌনাঙ্গ, যৌনাচরণ, ইত্যাদির জন্যে এত অধিক সংখ্যক প্রতীকই বা কেন?

চিত্রায়িত (pictorialized) চিন্তা হিসেবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করে সি.এস. হল বলেন যে ছোট শিশু, জড়বুদ্ধি-স্কিজোফ্রেনিক এবং আহত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ঐরূপ আদিম রূপের চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়। শিশুদের সম্পর্কে পিয়াজেটের (Piaget, ১৯৬০) পর্যবেক্ষণও হলের

স্বপ্নব্যাখ্যার সমানুপবর্তী। পিয়াজেট দেখতে পান, খুব ছোট শিশুরা স্বপ্নকে দৃশ্য বাস্তব হিসেবে ভুল করে, স্বপ্নান্তর্গত কেউ কিংবা কোনো কিছু ঘরের মধ্যেই রয়েছে মনে করে। স্কুল-বয়সে এসে আর স্বপ্নকে তারা বাস্তব মনে করে না, তথাপি একে মনে করে তারা তাদের বাইরের, প্রক্ষিপ্ত, কোনো কিছু। আরো কয়েক বছর পরেও শিশু স্বপ্নকে ভাবে অন্তর্গত মানসচিত্র—ছবি কিংবা চিন্তা এবং এ-দুয়ের মধ্যবর্তী গোলমেলে কিছু। উদ্বেগসঞ্চারী চিন্তার ছদ্মবেশী প্রতিনিধি হিসেবে স্বপ্নপ্রতীকের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে বাতিল করে দিয়ে স্বপ্নপ্রতীকের এক জ্ঞানোৎপাদক তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন সি.এস. হল। বলেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তি, তাড়না কিংবা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে কারো প্রত্যয়ের সর্বোত্তম প্রকাশ হচ্ছে একটি প্রতীক। যেমন, গরুকে প্রতিপালনকারী মনে করলে কেউ একজন স্বপ্নে প্রতিপালক মাকে গরু হিসেবে দেখতে পেতে পারে। আবার মাকে যার বিরূপ প্রকৃতির মনে হয়, সে মাকে স্বপ্নে দেখতে পেতে পারে ডাইনী হিসেবে। স্বপ্নপ্রতীকের সুবিধে এই যে সময় এবং চেষ্টার দিক থেকে তা মিতব্যয়ী। স্বপ্ন সম্পর্কে সরল রূপের এবং অল্পবল্প চিন্তার ধারণা, স্বপ্নের জ্ঞানোৎপাদক তত্ত্বের মতন, স্বপ্নপ্রতীকের এই তত্ত্ব থেকেও সমর্থন পায়। ঘুম এবং অত্যন্ত জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মধ্যকার অসঙ্গতির প্রচলিত ব্যাখ্যার সঙ্গেও হলের স্বপ্নপ্রতীক তত্ত্বের মিল রয়েছে।

জেগে গিয়ে মানুষ স্বপ্নের যে-বর্ণনা দেয়, সেখানে অবশ্যই ফ্রয়েড নিজের তত্ত্বের জন্যে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করেছেন। কেননা, যুক্তিপূর্ণ-সঙ্গতিপূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে মানুষ স্বপ্নকে একটি মসৃণ বহির্তোরণ (facade) প্রদান করে, কিংবা ভুলক্রমে ফাটল, চূর্ণ, ইত্যাদি দেখায়। তথাপি, এটাকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়ে, স্বপ্নের প্রাপ্ত বিবরণের ব্যাখ্যায়ই পূর্বোল্লিখিত স্বাধীন অনুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগের কথা ফ্রয়েড বলেছেন।

অপর এক স্বপ্নবিদ, টি. এম. ফ্রেঞ্চও স্বপ্নের চিন্তার সরল গড়নের কথা বলেছেন (*স্লীপ, ড্রিমস্ এ্যাণ্ড এরাউজাল*—এডওয়ার্ড জে. মুরে)। স্বপ্ন হচ্ছে 'বস্তুর এককে চিন্তা'—সমস্যা-সমাধানের বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা কখনো প্রতীক, কখনো মোহ। (সিজোফ্রেনিক রোগীদের কথা বলতে গিয়ে ফ্রয়েডও

সচেতন চিন্তায় বাস্তব বিষয় এবং শাব্দিক ধারণা (verbal concept)—উভয়ের, এবং অচেতন চিন্তায় শুধু বাস্তব বিষয়ের উপস্থিতির কথা বলেছেন।) টি. এম. ফ্রেঞ্চ স্বপ্নেও জাগ্রত অবস্থার সমান সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সমস্যা–সমাধানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমাধানের ভাবনা জাগ্রত অবস্থায়ই উদ্ভূত হয়েছিল, স্বপ্নে এসে শেষ হয়েছে মাত্র। হল–ফ্রেঞ্চ, প্রমুখের এইসব চিন্তাভাবনা উল্লেখ করে এডওয়ার্ড জে মুরে বলেছেন, "স্বপ্ন লক্ষ্যমুখী এবং সমস্যা–সমাধানে জড়িত হতে পারে, কিন্তু বিমূর্ত চিন্তার অনুপস্থিতিতে স্বপ্ন সীমাবদ্ধ বটে। তার ফলে এও জোর সত্য মনে হয় যে, স্বপ্নের সময় মস্তিষ্কের নিম্ন নবীকরণ কাঠামো (lower integrative structures)—সম্ভবত লিম্বিক ব্যবস্থাটি—সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং বিমূর্ত বাক্য–কার্যক্রমের মীমাংসাকারী উচ্চ মস্তিষ্কের পর্যায়টি তুলনামূলক নিস্তেজ (quiescent) থাকে।" মুরের এই বক্তব্য থেকে আই. পি. পাভলভের অভিমতের দূরত্ব অধিক নয়।

স্বপ্নের উদ্ভব এবং ভূমিকা সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্যের অনেক স্বাভাবিক ও সঙ্গত সমালোচনা চোখে পড়ে। গরু–ঘোড়ার মতো নিম্নস্তরের প্রাণীরাও স্বপ্ন দেখে—সে–ক্ষেত্রে তারাও কি ইচ্ছেপূরণের তৃপ্তিই পায়? জবাবে ফ্রয়েডও একটি পুরনো প্রবচন উল্লেখ করেছেন, "What do geese dream of? of maize."—"হাঁসেরা কিসের স্বপ্ন দেখে? ভুট্টার।" খাদ্যের প্রতি আকাঙ্খাও কি ফ্রয়েডের "নির্জ্ঞান" মনেই বাস করে? নাকি, হাঁসের এই স্বপ্ন স্বপ্নের মস্তিষ্কভিত্তিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই সমর্থন যোগায়?

উদ্বেগ–বিষয়ক স্বপ্ন তথা দুঃস্বপ্নও কি তাহলে ইচ্ছেপূরণ করে? ঘুম–রক্ষার ভূমিকাও তো স্বপ্ন পালন করে না; ঘুমন্ত মানুষ দুঃস্বপ্নের তাড়নায় জেগে যায়। ফ্রয়েডের জবাব : ইচ্ছের চাপ বা শক্তির ভার বহন করতে উক্ত স্বপ্নের ব্যর্থতার কারণেই এরকমটা ঘটে। উদ্বেগবাহী ইচ্ছের (Id) সাথে বিবেকের (super-ego) দ্বন্দ্বের তীব্রতা এমন পর্যায়ে যায় যে, সংজ্ঞানের কোনো প্রহরা বা মধ্যস্থতা আর কার্যকর হয় না, মোচনের তৃপ্তিও ঘটে না, ইত্যাদি। দুঃস্বপ্নের ওপর ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়েছেন আধুনিক স্বপ্নব্যাখ্যার পথিকৃত আর্নেস্ট জোন্স—তিনিও যৌন বিষয়াদিকে দুঃস্বপ্নের উৎস হিসেবে

গণ্য করেছিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ড জে. মুরে বলেছেন যে জোনসের এই অভিমত যুদ্ধ–মনোবিকলন (war neuroses)–সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে না. রণক্ষেত্রের স্বাভাবিক উদ্বেগই সেখানে সর্বাধিক (Grinker and Spiegel, 1945)। এম ফেল্ডম্যানের সমীক্ষায়ও (*Research Study on Nightmares*, Unpublished data, Deptt of. Psychology, Buffalo University) দেখা যায় যে দুঃস্বপ্নের অধিকাংশ বিষয় হচ্ছে অসহায়ত্ব কিংবা মৃত্যু। ফেল্ডম্যানের সমীক্ষার এই সিদ্ধান্ত ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের তুলনায় অস্তিত্ববাদী বিচারকেই বরং সমর্থন দেয়। প্রকৃতপক্ষে, বিচিত্র সব ভয়ভীতিই দুঃস্বপ্নে প্রতিফলিত হয়। ফ্রয়েডের *The Interpretations of Dreams* (১৯০০) বইটির কথা অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু *Beyond the Pleasure Principle* (১৯৫০) বইয়ে ফ্রয়েড নিজেই স্বপ্নসহ অনেক বিষয়ে স্বীয় মত পরিবর্তন করেছিলেন, আঘাত–সদৃশ (traumatic) যুদ্ধ–অভিজ্ঞতাভিত্তিক দুঃস্বপ্নের সংখ্যাধিক্য দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তবে এ নাকি আঘাতসদৃশ দৃশ্যকে পুনরাবৃত্ত করার মধ্য দিয়ে তাকে আয়ত্ত করারই ব্যাপার। এবং স্বপ্নের এই ভূমিকাও নাকি ইচ্ছেপূরণসহ নিদ্রা–প্রহরীর আদিম ভূমিকার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু নয়।

স্বপ্নের ইচ্ছেপূরণকারী ভূমিকার ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন এফ স্নাইডার, এ, ট্রসম্যান এবং এম, উলম্যান। তাঁরা বলেছেন যে, ইচ্ছে–আবেগ কি করে সুনির্দিষ্ট বিরতিতে আবির্ভূত হবে? দিনের যন্ত্রণারা কি করে পূর্ব–নির্ধারিত সময়ে হাজির হবে? এরূপ সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে সি, ফিসার এবং ডব্লিউ, ডিমেন্ট বলেছেন যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির চাপ (Id) এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতার (ego) পর্যাপ্ততা ও ভারসাম্যের ওপরই সামগ্রিক স্বপ্ন–সময় নির্ভর করে। এমন উত্তরের সমর্থনে তাঁরা এমন একজন পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, যার কিছু মানসিক সঙ্কট দেখা দেয়ায় আর ই এম–ঘুম বেড়ে সমগ্র ঘুম–সময়ের অর্ধেকে পৌঁছায়। অন্য একাধিক সমীক্ষায় (যেমন, আই অসওয়াল্ড, ১৯৬৩) অবশ্য দেখা গেছে যে মানসিক সঙ্কটগ্রস্ত হলে মানুষ কম ঘুমোয়, এবং স্বপ্ন–ঘুম ও গভীর ঘুমের মধ্যকার সময়ানুপাত হয় অপরিবর্তিত থাকে, কিংবা

স্বপ্ন-ঘুম কমেও যায়। ফিসার এবং ডিমেন্ট তাঁদের উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে দিনের মানসিক চাপ নিরসনে স্বপ্নের সেফটিভালভের ভূমিকা পালনের ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু দেখাই তো গেল যে, এক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ অসম্পূর্ণ এবং মিশ্র। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও চূড়ান্ত কিছুই বলা যায় না।

ইতোমধ্যে উপস্থাপিত ফ্রয়েড এবং অনেক আধুনিক স্বপ্নসমীক্ষকের বক্তব্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এডওয়ার্ড জে, মুরে শেষ পর্যন্ত এটাই বলেছেন যে, "স্বাভাবিক ঘুমের প্রক্রিয়ায় মানুষ ঘুমের একটি সুসমন্বিত পর্যায় থেকে জাগ্রত অবস্থায় যায়। গুরু মস্তিষ্কবল্কল আংশিকভাবে জাগ্রত হয় এবং চিন্তা-প্রক্রিয়া দেখা দেয়। ওই জাগরণকে চিন্তা-অনুষঙ্গের জন্যে অর্গল-উন্মোচন বলে ভাবা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কর্মোদ্‌গাতা (proponent) অনুষঙ্গসমূহ—দিনের উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে জড়িত অনুষঙ্গসমূহ--অর্গলের নিকটবর্তী থাকবে এবং প্রথমে দেখা দেবে।" এরকম বক্তব্য একপ্রান্তে এরিস্টোটল-সিসেরোকে, একেবারে অন্যপ্রান্তে সেচেনভ-পাভলকে স্মরণ করায়, স্বপ্নের কারণ সম্পর্কে বহিরুদ্দীপক এবং শারীরবৃত্তীয় ধারণাকেই সমর্থন যোগায়। বাস্তব দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রের আকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে স্বপ্ন হিসেবে বর্ণনা করার সি, এস, হলের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

বিশ্লেষণের এই কমবেশি বস্তুবাদী ধারায় ঘুমকে বলা হয়েছে হ্রাসপ্রাপ্ত (reduced) জাগরণ। ঘুম থেকে জাগরণে মানুষ যেন চেতনার একটি অন্তবর্তীকালীন পর্যায়কে, গোধূলির কালকে পেরোয়। আর, স্বপ্ন এই ঘুমের অন্তর্গত জাগরণের সর্বোচ্চ সীমা। যদিও উদ্দীপকের বর্ধিত প্রবেশপথ এবং মাংসপেশির শৈথিল্যের লক্ষণে মনে হতে পারে যে স্বপ্ন হচ্ছে গভীরতর ঘুম। বস্তুবাদী বিশ্লেষণের এই পাশ্চাত্য ধারায় সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্নায়ু-শারীরবৃত্তীয় তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে স্বপ্ন নিম্ন মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং এক ধরনের আবেগী জাগরণ ঘটায়। স্বপ্ন সাধারণ জাগরণের তুলনায় সহজতর জ্ঞনার্জন-প্রক্রিয়ার (cognitive function) ব্যাপার। প্রহরা, ছদ্মবেশ-ধারণ, ইত্যাদি ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা তাই অবান্তর। সি, এস,

হল সেক্ষেত্রে বলেছেন, স্বপ্ন হচ্ছে চিন্তার দৃশ্যায়িত (pictorilized) এবং সে যুক্তিতে সহজীকৃত রূপ। তথাকথিত প্রতীক ঘুমন্ত ব্যক্তির চিন্তাভাবনার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। স্বপ্নের অনেক-অনেক ভূমিকার কথা যা বলা হয়েছে, সে-সম্পর্কেও এটুকুই মানা যায় যে, জাগরণপ্রাপ্ত (aroused or uninhibited) ঘুমের আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিজনিত ছন্দেরই (endogenous rhythmic period) ফল হচ্ছে স্বপ্ন। আর এসবই প্রকারান্তরে বস্তুবাদী স্বপ্নচিন্তার চিহ্ন, প্রমাণ, যে চিন্তাধারার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে, বলেছি, সেচেনভ–পাভলভে।

তবে শুধু ফ্রয়েডের নয়, ইয়ুং-এ্যাডলার-স্কিনার প্রমুখ বিখ্যাত ফ্রয়েড-অনুসারীদের স্বপ্নতত্ত্ব সম্পর্কে বললেই কেবল মূল ফ্রয়েড-প্রসঙ্গ শেষ হবে।

ইয়ুং

ফ্রয়েড এবং ইয়ুং সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে গার্ডনার মার্ফি যা বলেছিলেন, তার তাৎপর্যই প্রথমে অনুধাবন করা দরকার। *এ হিস্টরিক্যাল ইনট্রোডাকসান টু মর্ডান সাইকোলজির* সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে মার্ফি লিখেছেন :

"তাঁর (ফ্রয়েডের) তত্ত্বসমূহ যতই জল্পনামূলক (speculative) হোক না কেন, তারা শরীর ও মনের সম্পর্কের ঊনবিংশ শতাব্দীর অদ্বৈতবাদী (monistic) প্রত্যয় থেকেই উদ্ভূত, এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সকল দিককে তাতে জীবন্ত প্রাণীর কোষকলায় অবস্থিত বিবর্তনমূলক বাস্তবের প্রকাশ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। ইয়ুং-এর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথম জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তির এবং আধ্যাত্মিক ভবিতব্যের প্রত্যয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়, এবং দশকের পর দশক যেতে থাকলে এটা আরো বেড়ে যায়।"

অর্থাৎ, ইয়ুং ফ্রয়েডের চেয়ে অধিক না হলেও, মূলত ভাববাদীই। *কনসাস্, আনকনসাস্ এ্যাণ্ড ইণ্ডিভিজুয়েশান* বইয়ে ইয়ুং বলেন, 'চেতন জন্ম নেয় অচেতন মন (psyche) থেকে, যা কি-না অধিকতর বয়সী এবং

যা চেতনের সাথে একযোগে এবং চেতন সত্ত্বেও কাজ করে চলে।" সাধারণভাবে, উল্লিখিত 'মন' (psyche) বলতে ইয়ুং চেতন-অচেতন উভয়কেই বুঝিয়েছেন এবং স্বপ্নকে বিবেচনা করেছেন এই মনের (psyche) স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত উৎপাদন। এই মনের শক্তি (psychic energy) তথা সাধারণ প্রাণশক্তিকেই আবার ইয়ুং বলেছেন লিবিডো। তবে, ফ্রয়েডের মতো ইয়ুং লিবিডোকে শুধু যৌনশক্তি মনে করেন নি। ইয়ুং-এর মতে যৌনকামনা লিবিডোর এক ধরনের রূপ মাত্র। (বার্গসঁ যাকে বলেছেন ইলান ভাইটাল, ইয়ুং-এর লিবিডো অনেকটা তাই।) ইয়ুং-এর নির্জ্ঞানও ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানের চেয়ে ভিন্ন। স্বপ্নকে ইয়ুং (ফ্রয়েডের মত) নির্জ্ঞানের দিকে পশ্চাদগমন (regression) মনে করেছেন—তবে এ শুধু ব্যক্তি-নির্জ্ঞান নয়, সমষ্টিনির্জ্ঞান, জাতিনির্জ্ঞানও। স্বপ্ন ও নিউরোসিসের ঘটনা ও কাহিনীকে বিশ্লেষণ করে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কাঠামোর সাথে তাদের মিল লক্ষ্য করেছিলেন ইয়ুং, এবং সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শৈশবের স্মৃতি ছাড়াও সমষ্টি ও জাতিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে। (এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরো বেশি সরে যাওয়া।) অন্যভাবে বললে, প্রতিটি ব্যক্তির মনে সঞ্চিত আদিম রূপকসমূহ (primordial images) মানবমনের আদিমতম-গভীরতম সার্বজনীন ভাবনা, কারণ, দেশে-দেশে গাথা-পুরাকাহিনীতে অনেক সদৃশ উপাদান আছে। (প্রকৃতপক্ষে এরূপ সদৃশ উপাদান জীবন-যাপন-পরিমণ্ডল ও পদ্ধতির সাদৃশ্যেরই পরিণতি। এলিয়ট স্মিথ ও অন্য অনেক নৃতত্ত্ববিদের মতে, এই সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে ভ্রমণসূত্রে লোকমুখে কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারও।) ব্যক্তিমানসে গোটা প্রজাতির স্বাক্ষরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইয়ুং আরো বলেছেন, "শরীর যেমন ফিলোজেনেটিক বিকাশের চিহ্ন বহন করে, মনুষ্য মনও তেমনই। আমাদের স্বপ্নরূপকগুলোর আদিম ধরনের চিন্তার অবশেষ হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু নেই।" যা-ই হোক, বাধাপ্রাপ্ত ও পুঞ্জীভূত প্রাণশক্তি (লিবিডো) যখন অভিযোজনের তথা মানিয়ে নেয়ার প্রয়াস পরিত্যাগ করে, পশ্চাদ্‌গমনের পথে তখন তা অতীতে ফিরে যায়—ইয়ুং এর মতে স্বপ্ন তেমন এক অভিযোজন প্রয়াস। স্বপ্নের মধ্যে নির্জ্ঞানের ভাণ্ডারে

তা অনেক নূতন-নূতন সূত্র খুঁজে পায়, অভিযোজন সহজ হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিমানসের যে মূল্যবান প্রবণতাগুলো জানা দরকার, স্বপ্নসূত্রে তাও জানা যায়।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের কার্যকারণ সম্পর্কিত এবং খণ্ডিত করণের (causal and reductive) পদ্ধতি বাদ দিয়ে ইয়ুং তার সংশ্লেষণ ও সংগঠনমূলক (synthetic constructure) পদ্ধতি গড়ে তোলেন। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যা যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective), ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা নাকি সেখানে বিষয়মুখী (objective)। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার বাইরে সমষ্টিনির্জ্ঞানের রূপকে নাকি তা প্রতিষ্ঠিত। এসবই অবশ্য স্বপ্নবিদদের নিজেদের দাবি। পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইয়ুং ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গের অতিরিক্ত ১০০টি উদ্দীপক শব্দের (stimulus words) একটি পরীক্ষাপদ্ধতি দাঁড় করান। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে ওই উদ্দীপক শব্দসমূহের একটির প্রভাবে উদ্দীপিত শব্দ দ্বারা সাড়া দিতে বলা হয়। সাড়া দিতে বিলম্ব, দ্বিধা, ব্যর্থতা কিংবা উদ্দীপক শব্দটিরই পুনরাবৃত্তি, কিংবা খুব দূর অথবা অস্বাভাবিক সাড়া বিবেচিত হয় একটি গূঢ়ৈষা (complex)-র সূচক হিসেবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির মানসলোকে (psyche) পাওয়া যায় বাইরের পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত ব্যক্তিত্বের (বা মুখোশের) একাংশকে, ইয়ুং যাকে বলেছেন পার্সোনা (persona)। আর সমষ্টি নির্জ্ঞানে রয়েছে একটি অবলুপ্ত ব্যক্তিত্ব, যেন পৌরুষের নারী অংশ, ইয়ুং যাকে বলেছেন এ্যানিমা (anima)। ইয়ুং–এর মতে, অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত গুণগুলোই কারো পার্সোনা, আর, অবিকশিত পাশবশক্তিই এ্যানিমা। এরা পরস্পরবিরোধী, সদ্যযুধ্যমান। যার পার্সোনা পুরুষালি, তার এ্যানিমা নাকি নারীসুলভ। এই পার্সোনা আর এ্যানিমা যেন হেনরি জেমস-কথিত মনের 'সদর' আর 'অন্দর'। ম্যাকডুগালের স্বপ্নের ইয়ুং-প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুনে এসবই অধিকতর বোঝা যাবে, প্রথমে মূল স্বপ্ন, তারপরে ব্যাখ্যা এবং সর্বশেষে কিছু মন্তব্য, আলোচনা :

"তাবু ভেঙ্গে ফেরার পর আমি কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য সেখানকার সেলে (sale) উপস্থিত। সমচতুষ্কোন রকটি ক্যানভাসের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি। তাঁবুর ভেতরকার মেঝে প্রায় তিন ফুট উঁচু। দুদিকে

ঝোলানো ক্যানভাসের আলগা টুকরোর একটা পাশ গুটোনো। মেঝের ওপর আমার কুকুরটাকে দেখলাম। সে বেরিয়ে আসতে চায়, অথচ পারছে না। সে লাফ দিলেই ত' পারে। কেন লাফ দিচ্ছে না? মাঝামাঝি ক্যানভাসের পার্টিশন দিয়ে তাঁবুটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি ঘুরে অন্যধারে গিয়ে আলগা ক্যানভাস সরিয়ে কুকরটাকে ডাকলাম। কুকুরের বদলে একটা বছর দুয়েকের বাচ্চা বেরিয়ে এল। আমার ছেলেরাও ঐ বয়সে প্রায় ঐ রকমটি দেখতে ছিল। সে আমার কোলে উঠতে চাইলো। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতেই দেখি আমার স্ত্রী এক বৃদ্ধ জেনারেলের সাথে বেরিয়ে এলেন।'

"এই স্বপ্নটির কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে ম্যাকডুগ্যাল ইয়ুং–এর কাছে এটিকে হাজির করেন ব্যাখ্যার জন্য। ঐ সময় ম্যাকডুগ্যাল ইংল্যান্ডের বাস তুলে দিয়ে আমেরিকা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। স্বপ্নটির মধ্যে, ইয়ুং এর মতে, সেই পরিবেশ বিধৃত। তাঁবু ম্যাকডুগালের ভবঘুরে জীবনযাত্রার প্রতীক। কুকরটি উদ্দাম স্বাধীনতাপ্রয়াসী সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পক্ষে ইংল্যান্ডের পরিবেশ অনুকূল মনে হচ্ছিলো না। ম্যাকডুগাল এই সহজাত প্রবৃত্তিকে চাপা দিয়ে রাখতে চান। কিন্তু পারছেন না। বাচ্চাটি ইয়ুং–এর পরিভাষায় kabyr–এর প্রতীক। যুক্তি আর প্রবৃত্তির মধ্যেকার সংযোগসেতু বোধ হয় এই kabyr, মনের অপরিণত স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, যাকে বলা হয় intuitive knowledge।

"আলগা ঝোলানো ক্যানভাসের টুকরো (flap) দিয়ে তাবুটিকে দুভাগ করা হয়েছে। এর মানে, সহজাত প্রবৃত্তি আর সজ্ঞার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। সজ্ঞাবৃত্তি সমীক্ষার পলে নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসতে চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ জেনারেল ম্যাকডুগালের মধ্যেকার পিতৃসুলভ বাৎসল্যগুণের প্রতীক। ব্যক্তিত্বের নানাদিক কিভাবে স্বপ্নের মধ্যে প্রতিভাত হয়—এই স্বপ্নটি তার নিদর্শন।

"ম্যাকডুগাল বলেছেন, ইয়ুং প্রদর্শিত স্বপ্নব্যাখ্যা এখানে সম্পূর্ণ মানুষটিকে তুলে ধরেছে। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে সমষ্টিনির্জ্ঞানে। স্বপ্ন সমষ্টিনির্জ্ঞানের দরজা খুলে অন্তর্লীন 'এ্যানিমা'কে

সংজ্ঞানস্তরে আনতে সাহায্য করছে ; ম্যাকডুগাল ও ইয়ুং ফ্রয়েডের মতোই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে মননক্রিয়ার স্বরূপ জানতে বদ্ধপরিকর। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মনকে জানার চেষ্টা গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। নির্জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ইয়ুং বাড়িয়েছেন, এতে দূরকল্পনা ও অনুমানের পরিধি বেড়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু জ্ঞানের মাত্রা বাড়ে নি। এক শ্রেণীর শিল্পীসাহিত্যিকের কাছে 'আদি প্রতিমা'র কল্পনা যতই গভীর তাৎপর্যব্যাঞ্জক হোক না কেন, মনোবিজ্ঞানের কাছে এর বিশেষ কোনো দাম নেই। আজকাল গ্যায়েটে বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ব্যাখ্যায় ইয়ুংকে টেনে আনছেন অনেক সমালোচক।...... শিল্পী-সাহিত্যিকের কল্পনা-উপমা-প্রতীকের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সূত্র বা সত্য খুঁজতে গেলে ঠকতে হবে।"

এ্যাড্‌লার

নির্জ্ঞান কিংবা লিবিডো নয়, তবে ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতাভিত্তিক, এবং সমান অন্ধ এবং বাস্তবতা-বর্জিত এক তাড়নাই এ্যাড্‌লার-মনোস্তত্ত্বেরও চাবি প্রত্যয়। প্রতিযোগিতার তথা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যে কথিত লক্ষ্য রোগী শৈশবে নির্ধারণ করেছিল, তাকে চিহ্নিত করা এ্যাড্‌লারের মনোসমীক্ষণের প্রধান লক্ষ্য। আর, পরিবারে রোগীর অবস্থান এবং শৈশবে তার পারিবারিক পরিস্থিতি, তার সবচে' পুরনো স্মৃতি, ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইতিহাস এবং উপন্যাসে তার "বীর"গণ, শৈশবের প্রিয় পেশাসমূহ—এই সবকিছুই নাকি রোগীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়। ফ্রয়েডের পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব-বিভাজনের (জ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের, ইড-সুপারইগো এবং ইগোর মধ্যকার বিভাজন, ইত্যাদি) বিরোধী ছিলেন এ্যাডলার। শুরু থেকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বরং ঐক্যের ওপর। প্রাণীরা সামগ্রিক কিংবা অখণ্ডভাবেই অগ্রসর হয় শ্রেয়তরের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ('striving for superiority') লক্ষ্যে। আর, ফ্রয়েড যদি অতীতের পরিমাপে মানুষের সকল আচরণকে ব্যাখ্যা করতে চেয়ে থাকেন, উপরোল্লিখিত কারণেই এ্যাড্‌লারের তত্ত্বের মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

হীনত্বকেও (inferiority) নানা ধরনের (সেই অঙ্গেরই বা অন্য অঙ্গের কিংবা মানসকাঠামোর) ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। হীনত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের (inferiority and superiority) এই ধারণা ছড়িয়ে রয়েছে এ্যাড্‌লারীয় মনোস্তত্ত্বের গোটা ভূখণ্ড জুড়ে। সকল মানুষ, মেয়েরাও নাকি শেষাবধি, 'মানুষ' (manly অর্থেই 'man') হয়ে উঠতে চায়, ইত্যাদি।

স্বপ্নকেও শুধু পুরনো ইচ্ছের পূরণ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না এ্যাড্‌লার ; বরং বর্তমান সমস্যার প্রতি রোগীর আবেগী দৃষ্টিভঙ্গিই নাকি স্বপ্ন থেকে জানা যায়। বাস্তব জীবনে যা সে করতে যাচ্ছে, তারই মহড়া এবং তার প্রতি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিই তার স্বপ্ন। বিয়ের প্রাক্কালে কোনো ব্যক্তি যখন সন্দেহ ও দ্বিধায় কাতর, তখন সে স্বপ্ন দেখেছে, দু'টো দেশের মধ্যবর্তী এক সীমান্তে তাকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বন্দী করার হুমকিও দেয়া হয়েছে। এ্যাড্‌লারের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের জন্যে এ এক সহজ স্বপ্ন। খণ্ড-খণ্ড অনুষঙ্গের পরিবর্তে একটি গোটা স্বপ্নের প্লটকে বিশ্লেষণ করতেও এ্যাড্‌লার অধিক আগ্রহী ছিলেন। স্বপ্ন–বিশ্লেষণের বেলায় রোগীর ওপর ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি প্রয়োগেরও বিরোধী ছিলেন এ্যাডলার। সুন্দর মানবিক সম্পর্ক ('good human relationships') –কে কাজে লাগিয়ে বরং বুঝিয়ে তুলতে হবে 'জীবনের একটি অপ্রয়োজনীয় দিকে' ('on the useless side of life') শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা সে কী ভাবে করছে এবং 'দরকারী দিকের' ('on the useful side') সুযোগগুলো কী ভাবে হারাচ্ছে। স্বপ্নেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সেই অন্ধ আয়োজনই।

স্কিনার

আই, পি, পাভলভের কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত তথা যান্ত্রিকভাবে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোস্তাত্ত্বিকগণ মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং সেভাবেই চান সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে কিংবা সমাজে পরিবর্তন আনতে, সেই ব্যবহারবাদীদেরই একজন হচ্ছেন বি, এফ, স্কিনার। এক্ষেত্রে তাঁরা আত্মোপলব্ধিতে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পরিকল্পিত ক্রিয়াকাণ্ডে সক্ষম মানুষকে মনে করেন ব্যবহারসমষ্টির

আধারমাত্র, যে-ব্যবহারকে ব্যবহারবাদীরা তাদের 'অপারেন্ট কন্ডিশনিং' পদ্ধতিতে পাল্টাতে পারেন বলে মনে করেন। এও মনে করেন যে, সমগ্র সমাজের মৌল পরিবর্তন ব্যতীতই এর বিভিন্ন অংশের আমূল সংস্কার সম্ভব। অথচ প্রকৃতপক্ষে, চেতনাও শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের (বাকক্ষমতার) প্রক্রিয়া নয়, চেতনার উন্মেষ ও অভিব্যক্তি-পরিণতিতে সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত। মার্ক্স বলেছিলেন "আদি থেকেই চেতনা একটি সামাজিক উৎপাদন এবং যদ্দিন মানুষেরা নিদেনপক্ষে টিকে থাকবে, তদ্দিন এটা তা-ই থাকবে।" স্কিনার (তাঁর *Walden Two* উপন্যাসে) মনে করেন যে, গোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে শৈশব থেকে এমনভাবে পরাবর্ত গড়ে তোলা সম্ভব, যার ফলে তারা ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থকে অভিন্ন মনে করবে। অন্যান্য ব্যবহারবাদীদের মধ্যে ডেলগার্ডো চান মগজে ইলেট্রোড বসিয়ে মানুষের আক্রমণমুখিতা দূর করতে, ম্যাকলুহান চান মিডিয়াবিপ্লবের সাহায্যে মানসিকতার বিপ্লব ঘটাতে, আর এরিক ফ্রম ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষার সাহায্যে সম্পন্ন করবেন এক মানবিক বিপ্লব। স্বপ্নকেও স্কিনার মনে করেন এক ধরনের ব্যবহার। এক্ষেত্রে এটা দৃষ্টিগত ব্যবহার (perceptual behaviour)। জাগ্রত এবং নিদ্রিত অবস্থার দেখা অর্থাৎ জাগরণ এবং স্বপ্নের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে শুধু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ; স্বপ্ন দেখার বেলায় নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, চলে যায়। চোখের তারার ঘূর্ণন এবং কানের পেশির নড়াচড়া থেকেও বোঝা যায় যে, স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘূর্ণন কিংবা নড়াচড়া কিন্তু স্বপ্নসৃষ্টির কারণ ('input') নয়, ফল-লক্ষণমাত্র। বন্ধ চোখের পাতার নিচে কোনো দৃশ্যবস্তু কিংবা বহির্কানে শ্রবণযোগ্য কিছু থাকে না। সুতরাং, স্কিনারের মতে স্বপ্ন একটি নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ব্যবহার, অন্য যে ধরনের ব্যবহারকে পাল্টানোর মধ্য দিয়েই ব্যাপক বিশাল পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে স্কিনাররা, ব্যবহারবাদীরা মনে করেন।

স্বপ্ন : মস্তিষ্কনির্ভর ও যন্ত্রনির্ভর সমীক্ষা

প্রয়োজন ছিল স্বপ্ন-সম্পর্কিত মস্তিষ্কনির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার। এবং যন্ত্রনির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষারও, বস্তুবাদী তথা বৈজ্ঞানিক ঝোঁকের স্বপ্নচিন্তার ক্রমান্বয়িক অগ্রগতি সত্ত্বেও ঠিক সে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ইতঃপূর্বে ঐতিহাসিক কারণেই ছিল না। আর, ভাববাদী স্বপ্নচিন্তার সর্বশেষ-সর্বপ্রধান ধারক সিগমান্ড ফ্রয়েডের প্রায় সমসাময়িক কালেই (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) জন্ম নিয়েছিলেন বস্তুবাদী স্বপ্নতত্ত্বে যুগান্তর আনয়নকারী ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ। এই পাভলভের দেশে আবার পাভলভের সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন ইভান মিখাইলোভিচ সেচেনভ (১৮২৯-১৯০৫), মনোতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রকৃতি বিজ্ঞানের ধারার প্রবর্তক হিসেবেও যার পরিচয়-প্রদান হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। 'কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স,' 'আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স', ইত্যাদি যে সব বৈজ্ঞানিক ধারণার সূত্রে পাভলভ সর্বাধিক পরিচিত, তার প্রাথমিক "রিফ্লেক্স অংশ" সেচেনভেরই নির্মাণ। রিফ্লেক্সেস অব দ' ব্রেইন নামক বই লিখে শুধু স্বদেশে নয়, সারা বিশ্বেই আলোড়ন তুলেছিলেন সেচেনভ। এ-বইয়ে সেচেনভ লিখেছেন যে মানুষের তথাকথিত স্বেচ্ছাক্রিয়তা-স্বতঃস্ফূর্ততাও (voluntary activities) কার্য-কারণ-সম্পর্কিত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন ও সীমাবদ্ধ। তাঁর মতে, মানবজীবন কঠোর নিয়মের অধীন বলেই মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। পাভলভ আজীবন এই নিমিত্তবাদী (deterministic principle) তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তাঁর শর্তাধীন প্রতিবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলেন। (পাভলভ পরিচিতি)।

বস্তুবাদী ধারার অংশ হিসেবে মস্তিষ্কভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের ধারণা অবশ্য অনেক অনেক অতীত থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল। "পাঁচ হাজার বছর আগে মিসরের কিছু পণ্ডিত মনে করতেন, মস্তিষ্ক মনের আধার। গ্রিক দার্শনিক খ্রিস্টজন্মের চারশো বছর আগে ভেবেছিলেন যে হৃদয় ও আত্মার অধিষ্ঠান মগজে। ...ফরাসি দার্শনিক দেকার্তে প্রথম নিজের হাতে প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, মস্তিষ্ক থেকে প্রাণশক্তি নার্ভ বেয়ে এসে পেশিগুলোকে চালায়; যদিও তাঁর বক্তব্য আজ বাতুলের প্রলাপ, তবু...পরাবর্ত সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার জন্য তাঁর কাছে পাভলভ ঋণী। দেকার্তের পরে ফরাসি দার্শনিক ক্যাবানিস (১৭৫৭-১৮০৮) আরো এক ধাপ এগিয়ে এসে বললেন যে, পিত্তের সঙ্গে যকৃতের ও মূত্রের সঙ্গে বৃক্কের (kidney) যে সম্পর্ক, চিন্তার মতো উচ্চস্তরের মননক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের সেই সম্পর্ক। অনেক পরে, বিংশশতকের গোড়ার দিকে লেনিন তাঁর বিখ্যাত ম্যাটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম বইতে ক্যাবানিসের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। চিন্তা ও বস্তু দুই-ই সত্য, কিন্তু চিন্তা কোনো বস্তু নয়। অবশেষে পাভলভের ক্লাসিক পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে মননক্রিয়ার চিন্তনেও বস্তুবাদসম্মত ধারণা গড়ে তোলার কোনো পথ ছিল না। শর্তাধীন পরাবর্তের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করলো।" (পাভলভ পরিচিতি)।

মস্তিষ্কবিজ্ঞান সম্যক বোঝার জন্যে কিছু প্রাথমিক বিষয় জানতে হবে। প্রথমেই দেখা যাক, রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত ব্যাপারটি কি? বাইরের কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বা রিফ্লেক্স বলে। বলা হয়েছে যে, এই 'নির্দিষ্ট' কথাটি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাইরের ঘটনাটি যতবারই ঘটবে, ততবারই একটি নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে, অন্য কোনো ঘটনায় এই নির্দিষ্ট সাড়াটি জাগবে না। একটি নির্দিষ্ট সংযোজন-ব্যবস্থার ফলেই এটা সম্ভব হয়—অর্থাৎ পূর্বেই যেটা বলা হয়েছিল, কার্যকারণ সম্পর্ক সবক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট। পাভলভের বিশিষ্ট ভূমিকা এই যে, তিনি বললেন শারীরক্রিয়া-মনক্রিয়া—

প্রাণীর সব ধরনের ক্রিয়াকলাপই পরাবর্তক্রিয়া বা রিফ্লেক্স। এর পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশেরই ধারণা ছিল মননক্রিয়ার বিশেষ করে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা অসম্ভব, জটিল রহস্যে তারা ভরা। "শেরিংটনের মতো বিশ্বখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী মনে করতেন, নীচুর ধাপের প্রাণীদের কার্যকলাপ পরাবর্ততত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে, মানবমনের ব্যাপারে পরাবর্ত বা স্নায়ুতন্ত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা অচল। মানবমনের কোনো বাস্তব অধঃস্তর বা ভিত্তি আছে, একথা পণ্ডিতরাই মানতে চাইতেন না, কাজেই সাধারণ সব মানুষও মানসিকতার ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিতেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া যেন দুটি সমান্তরাল রেখা, তারা পরস্পরকে হয়তো প্রভাবিত করে, কিন্তু তাদের সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব নয়। পাভলভ মননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন, শারীরক্রিয়া-মননক্রিয়ার পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। এইভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন ঘটলো। পাভলভ তাঁর ক্রনিক পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শারীরবিদ্যা মনোবিদ্যার গবেষণায় একেবারে নতুন যুগের সূচনা করলেন।" (*পাভলভ পরিচিতি*)

পরাবর্ত আবার দুপ্রকারের, শর্তহীন ও শর্তাধীন। প্রাণীসমূহের মধ্যে এক-একটি প্রজাতি কতকগুলো ঘটনায় বা সংকেতে সাড়া দেবার প্রায়-অপরিবর্তনীয় কতকগুলো ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নেয়ার অভিজ্ঞতা তাকে এইসব ক্ষমতার অধিকারী করে। সাধারণভাবে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে এগুলোকে সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) বা প্রজাতিধর্ম বলা হয়। তবে বৈজ্ঞানিক বর্ণনায়, এরাও এক ধরনের পরাবর্ত, এবং প্রজাতি-রক্ষায় প্রয়োজনীয় এবং স্থায়ী বলেই পাভলভ এদের বলেছেন প্রজাতি-পরাবর্ত কিংবা শর্তহীন পরাবর্ত। দৃষ্টান্ত: হাতে পিন ফোটালে আপনা থেকেই হাতটা টেনে নেয়া, ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গোবৎসের চারপায়ে দাঁড়ানো এবং গোমাতার দুধের বাটে জিভ ঠেকানো, মুখে খাদ্য গেলেই লালা ঝরিয়ে কুকুরের সেই খাদ্যদ্রব্য ভিজিয়ে নেয়া, ইত্যাদি। এরা শারীরক্রিয়া, এমন শারীরক্রিয়া প্রজাতির প্রতিটি প্রাণী যা জন্মমুহূর্ত থেকেই সম্পাদনে সক্ষম। দ্বিতীয় ধরনের পরাবর্তের ফলে ঘটে

নানান মননক্রিয়া। এগুলো অস্থায়ী, প্রজাতির সব প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে দৃষ্টও নয়। এবং বহু শর্তের ওপর নির্ভরশীল বলেই এরা এরূপ। এবং, এজন্যেই পাভলভ এদের নাম দিয়েছেন শর্তাধীন পরাবর্ত। (প্রকৃতই বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের মননক্রিয়া ঘটে।) অন্যভাবে বললে বলা যায়, শর্তাধীন পরাবর্ত প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় আয়ত্ত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনেই প্রাণী বা ব্যক্তি বিশেষ গড়ে নেয় শর্তাধীন পরাবর্ত, অর্থাৎ কিছু নূতন ধর্ম, পরিবর্তিত পরিবেশের প্রয়োজন ফুরোলেই যারা চলে যায়। দৃষ্টান্ত : মুখে তরল এসিড ঢেলে দিলে কুকুর নানা প্রচেষ্টায় সর্বশেষে বিন্দু এসিডও বের করে দেবে—এজন্যে মুখভঙ্গি করবে এবং মুখে লালা ঝরিয়ে এসিডকে তরলীকৃত করে নেবে। এটা কুকুরের আত্মরক্ষামূলক প্রজাতিধর্ম, শর্তহীন পরাবর্ত। এখন এসিড মুখে ঢালবার কিছুক্ষণ পূর্বে একটা ঘণ্টা বাজানো হলে এবং কয়েকবার একই রকম করা হলে, তখন দেখা যাবে যে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুর মুখভঙ্গি করবে এবং তার মুখে লালা নিঃসরণ হবে। আর, এই প্রতিক্রিয়াকেই বলা হবে শর্তাধীন পরাবর্ত। তবে এও কিন্তু দেখা গেল যে, শর্তাধীন পরাবর্ত শর্তহীন পরাবর্তের ওপরই নির্ভরশীল। এসিডের সংকেতের সাথে যুক্ত হয়েছে ঘণ্টার সংকেত, অর্থাৎ পেশিসঞ্চালন ও লালা নিঃসরণের স্নায়ুপথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (ঘণ্টা শোনার) শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুপথ। আর, এই উচ্চস্তরের যোগাযোগ ঘটাচ্ছে নিম্নমস্তিষ্ক নয়, মস্তিষ্ক বল্কলের (cerebral cortex) বিশেষ গুণযুক্ত স্নায়ুকোষ, এদেরই এই ক্ষমতা রয়েছে। অন্যথায়, অর্থাৎ শর্তাধীন পরাবর্ত যদি শর্তহীনদের ওপর নির্ভরশীল না হতো, তাহলে অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন অনেক ঘটনা তথা উদ্দীপক মস্তিষ্কে প্রবেশ করে প্রাণীকে অস্থির করে তুলতো, ঘটতো বিশৃঙ্খলা, শক্তিক্ষয়। এবং ব্যবস্থাটা এরকম বলেই, প্রতিটি পরাবর্তই হয় উদ্দেশ্যসাধক,—প্রজাতিস্বার্থের কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের রক্ষক।

স্বপ্ন সম্পর্কে মস্তিষ্কনির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাটি বোঝার জন্যে মস্তিষ্কবল্কলসহ উক্ত মস্তিষ্কের ব্যাপারটি কমবেশি জানা দরকার। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের অর্থাৎ মানিয়ে নেয়ার তাগিদে মানুষের

মস্তিষ্কবল্কলের বিস্তার ঘটেছে, এবং মস্তিষ্কের আকার ও ওজন বেড়েছে। প্রয়োজনের মুখে মস্তিষ্কের কেন্দ্রকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ এবং সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে। বিবর্তিত মস্তিষ্কবল্কল বিশেষ-বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রে বা বিশ্লেষণ–অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে। ভিন্ন–ভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। এরূপ বিশেষজ্ঞ অঞ্চলের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সংযোজক অঞ্চলও।

মস্তিষ্ক–নির্ভরতার ব্যাপারটিকে যাতে কেউ ভুল না বোঝেন সেজন্যে এও বলা ভালো যে বাইরের পরিবেশ, তথা প্রকৃতি ও সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনেই কিন্তু নানারকম বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপককে স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষ থেকে মস্তিষ্কে–প্রেরণ এবং বহির্বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে ব্যবস্থা–গ্রহণ। এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে শর্তহীন পরাবর্ত যথেষ্ট সহায়ক না হয়ে কখনো–কখনো বরং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় বলেই পরিবেশের বিচ্ছিন্ন সব নূতনত্বের মোকাবেলায় প্রাণী নূতন গুণের তথা ব্যবস্থার অধিকারী হয়, তার সন্তানসন্ততিও তা লাভ করে—এবং তার আওতায় সম্ভব হয় পরিবেশসাপেক্ষ নূতন ধর্মের তথা পরাবর্তের উন্মেষ ও বিলোপ। এরূপ পরিবেশ পাল্টালেই এই ধর্মেরও বিলোপ ঘটবে এবং নূতনতর পরিবেশে নূতনতর ধর্ম গড়ে উঠবে। মূল কথা হচ্ছে, মস্তিষ্ক–নির্ভরতা বলতে শুধু শারীরবৃত্তীয় তথা দেহাভ্যন্তরীণ বাস্তব ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় নি, বাইরের তথা প্রাকৃতিক ও সমাজবাস্তবের প্রতি স্বীকৃতি ও সংবেদনশীলতাকেও সমানভাবে বোঝানো হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এও বলা দরকার যে, স্বপ্নের উৎস হিসেবে প্রাণীদেহের মস্তিষ্কাংশ যে উদ্দীপনা–উত্তেজনা কিংবা সংকেত লাভ করে, তাকে যে শুধুই প্রকৃতি বা সমাজ, অর্থাৎ বাইরের বাস্তব থেকে আসতে হবে, এমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, দেহের নিজের অভ্যন্তর থেকেও তারা আসতে পারে। এখানেই স্বপ্ন-সংকেতের উৎস খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন। ঘুমের সময় মস্তিষ্কের অধিকাংশ-নিষ্ক্রিয় যে বিশেষ অবস্থা থাকে (এ সম্পর্কে পরে বলা হবে), সে কারণেই বহির্গত–অন্তর্গত সর্বপ্রকার উদ্দীপনা অনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিকৃত–অতিরঞ্জিত প্রতিফলনের সাথে

সম্ভাব্য উদ্দীপনা-উৎসের এই কমবেশি অমিলই সৃষ্টি করে স্বপ্ন-সম্পর্কিত নানা রহস্য ও অলীকত্বের ধারণা। তাই, সর্বোপরি বক্তব্য হচ্ছে, মস্তিষ্কনির্ভর স্বপ্নতত্ত্বের কথা বলে শুধু যে উদ্দীপনা বা সংকেতের বাস্তব প্রক্রিয়াকরণ এলাকা হিসেবে মস্তিষ্ককে চিহ্নিত করতে চাওয়া হয় তা নয়, উদ্দীপনার উৎসের অংশের বাস্তব চরিত্রও নির্দেশ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা স্বপ্ন বিষয়টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতেই চাওয়া হয়।

তবে, শরীরে কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণী অঞ্চল ছাড়া এক ধরনের প্রান্তিক বিশ্লেষণী ব্যবস্থাও রয়েছে। সব উদ্দীপকই প্রথমে প্রানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থিত প্রান্তিক ব্যবস্থায় পৌঁছায়। প্রান্তিক বিশ্লেষক তখন উদ্দীপকের স্থূল ও প্রকৃতিগত গুণগুলোকেই শুধু, উদ্দীপকের সংখ্যা, শক্তি, স্থিতিকাল, ইত্যাদি যাচাই করে, প্রাণীর বেঁচে থাকা তথা অভিযোজনের ক্ষেত্রে যে-যাচাইয়ের খুব কিছু মূল্য নেই। তবে, উদ্দীপনা বা সংবেদন শেষ পর্যন্ত স্নায়ুতন্তুযোগে মস্তিষ্কস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণী অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণী ব্যবস্থার রয়েছে বিশ্লেষণসহ সামগ্রিক সংশ্লেষণের ক্ষমতা, অভিযোজনের প্রশ্নে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত পরাবর্ত গঠনের পূর্বে সংযোজক স্নায়ুকোষের (association neurons) মাধ্যমে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে আসা সংবাদ সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণী অঞ্চলে জমা হয়। তার ফলে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ দুয়েরই সুযোগ হয়, এবং পরাবর্তটি শেষে এমনভাবেই গঠিত হয় যে প্রাণীর বিভিন্ন দেহাংশের মধ্যে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। শর্তাধীন পরাবর্তের পূর্বোল্লিখিত সৃষ্টি ও বিলোপেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণী অঞ্চল। এজন্যে সাহায্য নেয় সে শুধু উত্তেজনা বা সংবেদনের নয়, নিস্তেজনারও। স্বপ্নের মস্তিষ্কনির্ভর ব্যাখ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই নিস্তেজনা প্রক্রিয়াটির।

শর্তহীন উদ্দীপকের উত্তেজনার (কুকুরকে খাদ্য প্রদানের) সাথে শর্তাধীন উদ্দীপকের উত্তেজনার (আলোর বা শব্দের) কালগত সংযোজন হবার ফলে দুই উত্তেজনা কেন্দ্রের মিলন ঘটে, নতুন মার্গপথ তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় শর্তাধীন পরাবর্তের। উক্ত মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী অঞ্চল এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। এসব কিছু পূর্বেও বলেছি বলেছি। কিন্তু প্রাণীর অভিযোজনের

জন্যে শর্তাধীন পরাবর্তের বিলোপ ঘটানোরও প্রয়োজন হয়। খাদ্য-ছাড়াই যদি বার বার ঘণ্টা বাজানো হয়, তবে একসময় শুধু শব্দে কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসরণের পরাবর্ত ক্রমশ দুর্বল হয়ে, শেষে সম্পূর্ণ থেমে যায়। এছাড়াও ওই সময় অন্য কোনো জোরালো বহিরুদ্দীপক (যেমন সাইরেন-জাতীয় অপরিচিত কোনো শব্দ শোনা, ইত্যাদি) কুকুরটিকে উত্তেজিত করলেও লালা-নিঃসরণ থেমে যাবে। এই থেমে যাওয়া বা নিস্তেজনাকেই পাভলভ বলেছেন ইনহিবিশান, যা ঠিক কোনো নিষ্ক্রিয়তা নয়, উত্তেজিত দুটো অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ার অর্থে এও সক্রিয়তাই, এবং মানবদেহের সূক্ষ্ম তথা প্রকৃত অভিযোজনের জন্যে উত্তেজনার মতো নিস্তেজনাও সমান জরুরি। উল্লেখিত দৃষ্টান্তে যেমন, শর্তাধীন উদ্দীপক (আলো বা শব্দ) যদি শর্তহীন উদ্দীপক তথা পরিবেশের (খাদ্যের) প্রয়োজনীয় সংকেত বহন না করে, অর্থাৎ বাইরের জগৎ সম্পর্কে যথাযথ না জানাতে পারে, তবে (খামোখা লালা ঝরে-ঝরে) লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাই, নিস্তেজনার জরুরি কাজ হয় দুটো উত্তেজনা-কেন্দ্রের মধ্যকার যোগাযোগ বন্ধ করে শর্তাধীন পরাবর্তটিকে থামানোই। (প্রসঙ্গত বলে রাখি, নিস্তেজনাও দুই প্রকার : (১) শর্তহীন বা বহির্জাত (শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার কালে প্রাণীর পরিবেশে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন থেকে যা ঘটে।), (২) শর্তাধীন বা অন্তর্জাত (খাদ্য না দিয়েই যদি ঘণ্টা বাজানো হয়)। যদিও নিস্তেজনা সম্পর্কে নানা কথা বলার রয়েছে, স্বপ্ন-প্রসঙ্গে আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশই শুধু আমরা বলবো। পূর্বেও বলেছি, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সর্বাধিক খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনেই নিস্তেজনার গুরুত্ব, উত্তেজনা ও নিস্তেজনার সংশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রাণী টিকে থাকতে পারে। তাছাড়া, উচ্চমস্তিষ্কের অতিকোমল কোষগুলো যেমন অতি সংবেদনশীল, তেমনি জোরালো ও দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা এদের জন্যে ক্ষতিকর। তাই, প্রাণীর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নিস্তেজনা প্রক্রিয়াটি একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাও পালন করে—তখন তাকে বলা হয় প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা। দীর্ঘ বিবর্তন পথে, অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা উপেক্ষা করার জন্যে মস্তিষ্ক প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনার এই ধর্মটি আয়ত্ত করেছে। উদ্দীপক যদি

সম্পদ বা বিপদের সঠিক নির্দেশ না দেয়, তবে প্রাণী আর সে উদ্দীপকের সংকেতে সাড়া দেয় না ; তখন উত্তেজনার পরিবর্তে নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা প্রাণীটি পায় বিশ্রাম। এই প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনার উদাহরণ হিসেবে পাভলভ বলেছেন ঘুমের কথা। জাগ্রত অবস্থায়ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে নিস্তেজনা বিরাজ করে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল উত্তেজনা তথা মনোযোগ সহকারে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে—কিন্তু ব্যাপক ও গভীর নিস্তেজনা নিয়ে আসে ঘুম। সারা দিনের উত্তেজনার চাপে সৃষ্ট ঘুম ক্লান্তি দূর করে, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে মস্তিষ্কোষকে রক্ষা করে।

নিস্তেজনার এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাটিকে পাভলভ অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন। স্নায়ুব্যবস্থার সহ্যশক্তির নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে, তদোধিক মাত্রার উদ্দীপক প্রয়োগ করা হলে, উত্তেজনার পরিবর্তে নিস্তেজনা নেমে আসে এবং গোটা স্নায়ু-ব্যবস্থাকে ও তার কর্মক্ষমতাকেও রক্ষা করে। উদ্দীপকের মাত্রা বাড়াতে থাকলে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কুকুরের বেলায় লালার ফোঁটা বাড়বে, একটি পর্যায়ে গিয়ে এই ফোঁটার সংখ্যা বাড়বে না। মাত্রা আরো বাড়াতে থাকলে দেখা যাবে লালার ফোঁটা বরং কমে আসবে, শেষ পর্যন্ত লালা-ঝরা থেমে যাবে, কুকুর খাদ্যবস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এরকম ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী নিশ্চয়। উদ্দীপকের মাত্রা বাড়ানোর সঙ্গে যখন প্রতিক্রিয়ার মাত্রা আর বাড়ে না, পাভলভ মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অবস্থাকে বলেছেন আপাতস্ববিরোধী অবস্থা (paradoxical phase) । এর পরে যখন উদ্দীপকের মাত্রা আরো বাড়ালে উত্তেজনা উল্টো নিস্তেজনারই সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের তখনকার অবস্থাকে পাভলভ বলেছেন অতিস্ববিরোধী অবস্থা (ultra-paradoxical phase)। আলোচনার এ পর্যায়েই স্বপ্ন প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যেতে পারে যে, ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্কের অধিকাংশ অংশে যখন নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তখনও উত্তেজিত থাকে মস্তিষ্কের এমন অংশসমূহের কর্মকাণ্ডের ফলই হচ্ছে স্বপ্ন। অর্থাৎ, মস্তিষ্কের আপাতস্ববিরোধী অবস্থাতেই মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে, মস্তিষ্কের এই ধর্মের ফলেই ঘুমের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে ধারণা-কল্পনার এমন উৎস অর্থাৎ স্মৃ

উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হয়। (মূর্ত বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-তরঙ্গ, শব্দ-তরঙ্গ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কে পৌঁছিয়ে যে উপলব্ধি ঘটায়, তা থেকেই পরবর্তী স্তরে গড়ে ওঠে ধারণা-কল্পনা, এবং এজন্যে মূল বস্তুর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না, তখন এই কল্পনা আর কল্পনা থাকে না, প্রায় প্রত্যক্ষদর্শন বা শ্রবণের মতোই উজ্জ্বল বা তীব্র হয়ে ওঠে।) মস্তিষ্কের উত্তেজনাক্লান্ত অবস্থায় ঘুমের মধ্যকার স্বপ্নসংবেদনও সৃষ্টি করে তীব্র প্রতিক্রিয়া, "এই সময় কল্পনার উৎস, মস্তিষ্কের মৃদু উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হয় ; কল্পনাস্মৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মতো স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। যার মস্তিষ্কে এরকমটি ঘটবে, তার স্বভাবতই মনে হবে উৎসটি বাইরের জগতেই আছে।" এবং একমাত্র এভাবেই যুগপৎ স্বপ্ন-দেখাকে এবং স্বপ্নের কাহিনীকে বাস্তব বা সত্য ভাবাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ব্যাপারটির ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ ভিত্তিক পরীক্ষা ও ব্যাখ্যাও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এ-যন্ত্রের পরীক্ষা করে জানা যায় যে, ঘুমের মধ্যেও কর্টেক্স 'সজাগ থাকে, তবে তার তখনকার কার্যকলাপ আর সচেতন থাকে না। কারণ, ঘুমের সময়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানের স্নায়ুতাড়না কর্টেক্সে পৌঁছানোর আগেই মধ্য মস্তিষ্কের রেটিকিউলার ফর্মেশান তাদেরে চাপা দিয়ে দেয়।... রেটিকিউলার ফর্মেশান যখন মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তখনও স্নায়ুতাড়না কর্টেক্স ও মগজের অন্যান্য অংশে সঞ্চালিত হতে থাকে। কিন্তু তা আর শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে আগত স্নায়ুতাড়নার ওপর নির্ভরশীল থাকে না।'

আংশিক উত্তেজনা এবং নিস্তেজনার একটি বিন্যাস তাহলে এইভাবেও ধরা পড়ে : ঘুমের মধ্যে কর্টেক্সের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের ফলে মস্তিষ্কের দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি অনুভূতিকেন্দ্র উত্তেজিত হয়। আর স্মৃতি সরবরাহ করে স্বপ্নের দৃশ্য, ঘটনাবলী, সংলাপ, প্রভৃতিকে। অর্থাৎ অতীতে দেখা-শোনা সমস্ত ঘটনা এবং সেসব সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় চিন্তা জমা থাকে যে স্মৃতিভাণ্ডারে, ঘুমের সময় তারা আমাদের কর্টেক্সের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়/অনুভূতিকেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে, তবেই আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নকে

জীবন্ত মনে হয়, কারণ, তখনও আমরা দেখি বাস্তব দেখার সময়কার মতোই মগজের দর্শন, ইত্যাদি অনুভূতিকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়ার ফলে। তবে, স্মৃতি থেকে ঘটনার দৃশ্য, শব্দ, ইত্যাদি শুধু নয়, আমাদের মনের চিন্তাও এসে স্বপ্নের ঘটনায় যোগ দিতে পারে—একেবারেই নতুন চিন্তাও, যা স্বপ্ন দেখার সময়ে পূর্ববর্তী চিন্তা ও ঘটনার যোগফল হিসেবে উদ্ভূত। এমনকি, স্বপ্ন-চলাকালে সৃষ্ট মগজের বাইরের স্নায়ু, উদ্দীপনাও কখনো কখনো কর্টেক্সে পৌছায় এবং স্বপ্ন-সৃষ্টিতে অংশ নেয়।

অনিস্তেজিত স্নায়ুকোষের অনুপাতেই তাহলে বোঝা যাবে ঘুমের গভীরতা তথা স্বপ্নের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য। গোটা গুরুমস্তিষ্কে জোরালো এবং গভীর নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ঘুম তখন স্বপ্নহীন এবং গভীর হয়ে উঠবে। স্বপ্ন সম্পর্কে প্রায় একই কথাকে প্লাটানভ বলেছেন একটু অন্যভাবে, তাতে স্বপ্ন সম্পর্কিত অলীকত্বের ধারণাদির ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় : "তারা (স্বপ্ন) দেখা দেয় উচ্চ মস্তিষ্কবল্কলের বিভিন্ন অনিস্তেজিত অংশের কাজের ফল হিসেবে। সে কারণেই আমরা যা স্বপ্নে দেখি, তা আমাদের অতীত উপলব্ধির ভিত্তিতেই তৈরি, সেসব উপলব্ধি তখন চরম বিচিত্র এবং কখনো-কখনো একেবারে অদ্ভুত সব যোগাযোগ তৈরি করে। ইভান মিখাইলোভিচ সেচেনফ যথার্থভাবেই বলেছেন যে স্বপ্ন প্রায়শই সম্ভাব্য উপলব্ধির অসম্ভব সব মিশ্রণ।"

স্বপ্ন মস্তিষ্ককোষের অনিস্তেজিত অংশের তৎপরতার ফল—এটা বলার পরও, অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে ঐশী নির্দেশ থেকে শুরু করে অপূর্ণ ইচ্ছা, নির্জ্ঞান, ইত্যাদি গভীরার্থক কোনো কিছুর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা নাকচ করার পরও কিন্তু পাভলভপন্থীরা স্বপ্নকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বলেন নি। কে, প্লাটানভ বলেছেন, খাবনামা ইত্যাদি যত তাৎপর্যহীনই হোক না কেন, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে চিকিৎসকরা স্নায়বিক কোনো রোগের কারণ বুঝতে সক্ষম হতে পারেন, কারণ, স্বপ্ন মস্তিষ্ক তথা স্নায়বিক প্রক্রিয়ারই ফসল। বিমান-দুর্ঘটনা এড়ানোর কিংবা দেখার পরে কোনো বৈমানিক যদি বারংবার বিমান দুর্ঘটনার স্বপ্নই দেখতে থাকেন, তাহলে কোনো চিকিৎসকই তাকে তখন

বিমান চালনার দায়িত্ব নিতে বলবেন না ; বিশ্রাম, বিনোদন কিংবা কিছু চিকিৎসার পরামর্শই বরং তাকে দেবেন।

প্লাটানভ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো তার পায়ে কুকর প্রচণ্ডরকম কামড় দিয়েছে। আত্মীয়-বান্ধবকে সে তার এই স্বপ্নের কথা বললো এবং কিছু সময় পরই দেখা গেল, তার সেই 'কামড়'-এর জায়গাটিতে ব্যথা শুরু হয়েছে এবং একটি ক্যান্সার টিউমারও দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সেটা-ই প্রমাণ হলো। এ ধরনের ঘটনা ঐশী স্বপ্নের কল্পকাহিনী, কুসংস্কার, ইত্যাদিতে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো : দিনের বেলায় একটি প্রারম্ভিক অসুখ প্রায়ই অনুভবের পর্যায়ে আসে না, কারণ, গুরুমস্তিষ্কবল্কলে তখন নানা প্রাবল্যের অনেকানেক উদ্দীপনা এসে পৌছুতে যাকে। কিন্তু রাত্রে যখন বহির্জাত উদ্দীপনা থাকে না, বা নিদেনপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়, তখন এরূপ বেদনা-সংবেদন চেতনায় পৌছায় এবং কোনো ঘটনার স্বপ্ন সৃষ্টি করে। একই প্রসঙ্গে সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানী মিখাইল আইভানোভিচ এ্যাস্টভাৎসাতুরোভ লিখেছিলেন : "যদি মৃত্যুভয়ের উপাদানে পূর্ণ, বিরক্তি-উৎপাদক স্বপ্নে মানুষ হঠাৎ জেগে যায়, কিন্তু সেরকম রোগের কোনো লক্ষণ ব্যক্তির নিজের দিক থেকে না থাকে, তাহলেও হৃদরোগের সন্দেহ সৃষ্টি হয়।"

শিল্পী লেখক-কবি-বৈজ্ঞানিকদের বেলায় স্বপ্নে নানা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, সমাধান, ইত্যাদি লাভ করার ঘটনা উল্লেখ করে সৃজনশীল স্বপ্নের (creative dream) যে কথা বলা হয়েছে, প্লাটানভ বলেছেন, সে সবেরও ব্যাখ্যা রয়েছে দিনশেষের ক্লান্ত এবং রাতের অবকাশপ্রাপ্ত মস্তিষ্কের স্তরের গভীরে। সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে মানুষ একই কারণে বলে : "স্লীপ অন ইট"।

তাছাড়া, এও তো দেখা যায় যে ঘুম যত গাঢ় এবং দীর্ঘ, তত বেশি পুরনো সময় থেকে সংবেদন এবং উদ্দীপনা স্বপ্নে এসে হাজির হয়। পাভলভীয় তত্ত্বে উদ্দীপনার কেন্দ্রীভবন (ছড়িয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মূল উদ্দীপনাকেন্দ্র ফিরে আসা) এবং মস্তিষ্কের অবকাশ লাভ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মাধ্যমেই এরও ব্যাখ্যা সম্ভব।

এরূপ সব ব্যাখ্যার পরে পাভলভপন্থায় আমাদের আস্থা আরো বেড়ে যায়, কারণ, সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতাগুলোকে বাতিল না ক'রে এভাবে বরং তাদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। পাভলভ ছিলেন প্রকৃতই একজন বৈজ্ঞানিক, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ। পরিপাকগ্রন্থি নিয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবাদে ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পাভলব উদ্ভাবন করেছিলেন বিখ্যাত দীর্ঘস্থায়ী বা 'ক্রনিক' পদ্ধতি, শারীরবৃত্তিক ও মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে যা সম্পূর্ণ নতুন এক যুগের সূচনা করেছিল। প্রাণীকে পরিবেশ থেকে কিংবা দেহাংশকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক প্রকার খণ্ডিত ও যান্ত্রিক বিশ্লেষণের ভ্রান্তি ও ত্রুটি এর ফলে চিহ্নিত হয়, এবং বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পদ্ধতির দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে গোটা প্রাণীর জৈবিক বা মানসিক তৎপরতার পূর্ণ জ্ঞান লাভের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়। প্রসঙ্গত এও উল্লেখযোগ্য যে, পরিপাকগ্রন্থি নিয়ে কাজের সময় খাদ্য সরবরাহকারীর পায়ের শব্দে কুকুরের মুখে লালা–ঝরা থেকেই শর্তাধীন পরাবর্তের ধারণারও উৎপত্তি। কুকুরের এই আচরণের মানসিক প্রতিক্রিয়ার অংশের শারীরবৃত্তিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই গড়ে ওঠে শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোস্তত্ত্বও, বৃহত্তর ক্ষেত্রে যা মানসিক বা আত্মিক ক্রিয়ার মস্তিষ্ক–স্নায়ু, ইত্যাদিভিত্তিক তথা শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যারই তত্ত্ব।

অপরপক্ষে, সিগমাণ্ড ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান, অবাধ অনুষঙ্গ, ইত্যাদি তত্ত্বকে সাদা চোখেই যেমন মনে হয় অবৈজ্ঞানিক, তেমনি ফ্রয়েড নিজেও একদিকে স্বীকার করেছেন যে মানসিক ক্রিয়ার নিশ্চয় কোনো শরীরবৃত্তিক ভিত্তি রয়েছে, অপরদিকে বলেছেন যে যেহেতু তার নিজের শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই, সেহেতু তিনি মনস্তত্ত্বকে মনস্তত্ত্ব ধরে নিয়েই এগোবেন। অতঃপর সাধারণ তুলনামূলক বিচারই আমাদের স্বপবিশ্লেষণের এই দুটো প্রধান তত্ত্বধারার মধ্যে সঠিক তথা বৈজ্ঞানিকটিকে বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, স্বপ্নসহ যাবতীয় মননক্রিয়ার শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার ধারা অনুসরণ করতে গিয়েও দুটো প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিকভাবে এক করে ভাবাটা কিন্তু কখনোই ঠিক হবে না। সর্বাধিক নিরাপদ হয়, যদি এমন সকল বিচারের বেলায় ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য আমরা

মনে রাখি, *ডায়ালেকটিকস্ অব নেচার*-এ এঙ্গেলস্ প্রশ্ন করেছিলেন : "একদিন আমরা নিশ্চয় চিন্তাকে মস্তিষ্কের মধ্যকার আনবিক এবং রাসায়নিক গতিতেই চিনে নিতে পারবো, কিন্তু চিন্তার আত্যন্তিক মূল্য কি তাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে?" এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, "তাপ যে একটি আণবিক গতি এই আবিষ্কারটি ছিল যুগান্তকারী। কিন্তু যদি আমার এর চেয়ে অধিক কিছু বলার না থাকে যে তাপ হচ্ছে অনুর স্থানান্তর মাত্র, তবে আমার চুপ করে থাকাই শ্রেয়।" স্বপ্ন, ইত্যাদি প্রসঙ্গেও যারা বলতে চাইবে যে এসব কন্ডিশনড রিফ্লেক্স ছাড়া অন্য কিছু নয়, নিশ্চয় তাদের জন্যেও এঙ্গেলসের এই নীরব-থাকার পরামর্শ।

যন্ত্রনির্ভর স্বপ্নসমীক্ষা

হ্যান্স বার্জার ১৯২৯ সনে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম নামক যন্ত্রের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ পরিমাপক এই যন্ত্রটি ওই বিদ্যুৎতরঙ্গকে দশলক্ষগুণ শক্তিশালী করে একটি গ্রাফ কাগজের ওপর ফুটিয়ে তুলবে। জাগরণ, বিশ্রাম, ঘুম—এক-এক অবস্থায় এক-এক ধরনের লেখা পাওয়া যাবে। এরই মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখলে অর্থাৎ, এক ধরনের বিশ্রামের কালে সেকেন্ডে আট থেকে তেরো সংখ্যক স্পন্দন পাওয়া যাবে—এর নাম দেয়া হয়েছে এ্যালফা রিদম। তার আগে পূর্ণ জাগরণের সময় ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রামের লেখ (আমরা এরপর থেকে বলবো ইইজি, অর্থাৎ, ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ) হবে খুব দ্রুত, ছোট ছোট স্পন্দনের রূপ, চিন্তার রাজ্যে বিভিন্নভাবে সক্রিয় মস্তিষ্ককোষেরা তখন এক-এক দিকে ব্যস্ত, তালছন্দহীন। অপরপক্ষে, গভীর ঘুমের সময় স্পন্দনের আঁক হবে ধীরগতিসম্পন্ন ; দীর্ঘ, বড় বড় স্পন্দনের সংখ্যা তাই কমে গিয়ে দাঁড়াবে সেকেণ্ডে আধ থেকে দুই-এ, আর এ হচ্ছে ডেলটা রিদম। ১৯৫৩ সাল নাগাদ ক্লাইটম্যান এই যন্ত্রকে স্বপ্নসমীক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলেন—তার ফলে একই চার্টে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গের সাথে সাথে শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীরের নড়াচড়া এবং চোখের তারার কাঁপনের গতিবেগও লিপিবদ্ধ হতে পারলো।

ঘুমের সময় ইইজি পদ্ধতিতে রেকর্ডকৃত মস্তিষ্ক তরঙ্গকে নানা পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। লুমিস্-হারভে হোবার্ট (১৯৩৭)-উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় রয়েছে জাগরণ থেকে গভীর ঘুম পর্যন্ত বিস্তৃত পাঁচটি পর্যায়। ইমন্স্ এবং সাইমন (১৯৫৬) ষষ্ঠ একটি পর্যায় যোগ করেছেন। লুমিস্ পদ্ধতিটিই ব্যাপক ব্যবহৃত। ক্লাইটম্যান গ্রুপ অপেক্ষাকৃত সরল একটি ছকে চারটি পর্যায়ও ব্যবহার করেছেন। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি ঘুমের গভীরতার পার্থক্য অনুযায়ী ইইজি-পদ্ধতির পর্যায়গুলো চক্রাকারে পার হবে।

ন্যাথানিয়েল ক্লাইটম্যান এবং ই আসেরিনস্কি ১৯৫৫ সাল নাগাদ পূর্বোল্লিখিত চোখের তারার কাঁপনের সূত্রটি ব্যবহার করে স্বপ্ন-নির্ণয়ের একটি বাস্তব (objective) পরিমাপ উদ্ভাবন করলে যন্ত্রনির্ভর স্বপ্নগবেষণা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়। ঘুমন্ত শিশুদেরকে দেখে-দেখে ক্লাইটম্যান আগেই জানতেন যে চোখের তারা ঘুমের সময় এদিক-ওদিক ঘোরে। পরবর্তীতে ক্লাইটম্যান এবং আসেরিনস্কির মিলিত পর্যবেক্ষণে দেখা গেল যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা ঘুমিয়ে পড়ার প্রায় নব্বুই মিনিট পর থেকে তাদের দু'চোখের তারা খুব দ্রুত এবং একই সময় একই দিকে ঘোরে, যেন তারা মধ্য গ্যালারির দর্শক হিসেবে টেনিস খেলা দেখছে। এবং চোখের তারার এই দ্রুত ঘোরা এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ চলে। চোখের তারার এই দ্রুত ঘোরার নাম দেয়া হয় র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট, সংক্ষেপে আর-ই-এম। এই ব্যাপারটিকে অবশ্য ঘুমের প্রারম্ভে দৃষ্ট চোখের তারার অন্য এক ধরনের (ধীর, পেন্ডুলাম-ধরনের এবং বিচ্ছিন্ন) ঘোরা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। যা-ই হোক, স্বপ্নের সাথে আর-ই-এম-এর এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা গেল যে, এ-সময়ে জাগিয়ে দিলে শতকরা নিরানব্বুই জন লোকই বলে যে, তারা স্বপ্ন দেখছিল। অপরপক্ষে, ইইজি'র চিত্র এবং দেহের অন্যান্য পরিবর্তন দেখে মনে হয় যে, আর-ই-এম-এর সময় মানুষগুলো বুঝি জেগে রয়েছে—নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ, ধমনীর গতিবেগ, ইত্যাদি অনেকখানি জাগ্রত অবস্থার মানুষের মতোই—আবেগাপ্লুত কিংবা পরিশ্রান্ত মানুষের দশা যেন। এই সময় আবার ঘাড়ের এবং অন্যান্য দেহাংশের পেশি হয়ে পড়ে খুবই শিথিল, তাতে কিন্তু আবার মনে হওয়া সম্ভব যে ঘুম এ সময়ই

সর্বাধিক গাঢ়। এবং এই আপাতঅসঙ্গতির কারণে M. Jouvet-নামক জনৈক গবেষক এ অবস্থাটিকে বলেছেন প্যারাডক্সিক্যাল স্লীপ কিংবা আপাতস্ববিরোধী ঘুম। সে যা-ই হোক, আর-ই-এম-এর সময় মস্তিষ্ক-ক্রিয়া (cortical activity) যে অনেকটা জাগ্রত অবস্থার পর্যায়ে পৌছায়, ইইজি চিত্র দেখে সেটা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

ক্লাইটম্যান এবং আসেরিনস্কির মূল সমীক্ষায় আর-ই-এম-এর সময় জাগানোর ৭৪% ভাগ ঘটনায় স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, এবং আর-ই-এম বহির্ভূত সময়ে জাগানোর ১৭% ভাগ ক্ষেত্রে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে, ১৯৫৫ সালে ডিমেন্টের এবং ৫৭ সালে ডিমেন্ট এবং ক্লাইটম্যানের সমীক্ষায় এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০%—৮৮%, এবং ০%—৭% ভাগ। কেইলস, হোয়েডেমেকার এবং জ্যাকোবসনের সমীক্ষায় এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩% এবং ৬%।

কিছু সমীক্ষায় আবার কিছুটা অন্যরকম ফলাফলও পাওয়া গেছে। গুডএনাফ (Goodenough. et al) ১৯৫৯ সালে স্বপ্ন পান ৪৬%-৯৬% আর-ই-এম ঘুমে, ১৭%-৫৩% ভাগ আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমে। এই কম-বেশি নির্ভর করেছে সমীক্ষাধীন ব্যক্তিরা স্বপ্নাভ্যস্ত ব্যক্তি কি-না, তার ওপর। অরলিনস্কি স্বপ্ন পান ৮৫% ভাগ আর-ই-এম ঘুমে, ১৭% আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমে। ফাউকেস্ (Foulkes)১৯৬২ সালে স্বপ্ন পান ৮৮% ভাগ আর-ই-এম ঘুমে, ৭৪% ভাগ আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমে। আর, এটাই হচ্ছে আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমেও স্বপ্ন-পাওয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যা। সুতরাং, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আর-ই-এম ঘুমে তো স্বপ্ন পাওয়া যায়ই, আর-ই-এম-বহির্ভূত সময়েও মানুষ স্বপ্ন দেখে কিনা।

এ প্রশ্নের উত্তরে গুডএনাফ একটি সম্ভাবনার কথা বলেন : আর-ই-এম-ঘুমের অব্যবহিত পরে স্বপ্নের যে স্মৃতি থেকে যায়, আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমের সময় জাগানো হলে তারই বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। এই সম্ভাবনার সূত্র ধরেই যেন ওলপার্ট এবং ট্রসম্যান ১৯৫৮ সালে ৮৫% আর-ই-এম সময়ে স্বপ্ন পান এবং ৬৯% আর-ই এম-বহির্ভূত সময়েও। চোখের তারা ঘোরা বন্ধ হওয়ার পাঁচ মিনিট পরে স্বপ্নের টুকরো-টুকরো অংশ

বিবরিত হয়, দশ মিনিট পরে এই টুকরো স্বপ্নের সংখ্যাও খুবই কমে যায়। তখন প্রায় গভীর ঘুম। ১৯৬১ সালে কামিয়া গভীর ঘুমের সময়ও (synchronized stages of sleep) কিছু অন্তত স্বপ্ন পান। সমীক্ষার এমন সব ফলাফল উল্লেখপূর্বক এডওয়ার্ড জে মুরে উপসংহার টানেন যে, আর–ই–এম–বহির্ভূত সকল স্বপ্নকেই পূর্ববর্তী আর–ই–এম স্বপ্নের অবশেষ বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। গুডএনাফের মতন যারা শুরুতে এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, তারাও শেষাবধি এই মতের সপক্ষে প্রমাণ পান নি, আর–ই–এম ঘুমের এবং আর–ই–বহির্ভূত ঘুমের স্বপ্নের বিবরণে না কি কোনোই পার্থক্য হয় নি।

আর একটি সম্ভাবনা এই যে, আর–ই–এম–বহির্ভূত সময়ে দেখা এবং পরবর্তীতে বিবরিত সকল স্বপ্ন না কি প্রকৃত স্বপ্ন নয়। এটা না কি সম্ভব যে, সেগুলো হচ্ছে প্রায়–চেতন চিন্তা। এক্ষেত্রে স্বপ্নের সংজ্ঞা নির্ধারণেই সমস্যা দেখা দেয়। ফাউকেস্, রেক্‌টসাফেন, ভারদুনে এবং হুইটন (Foulkes, Rechts haffen, Verdone, Wheaton)–গ্রুপ এই মতের প্রবক্তা—তাঁদের সমীক্ষায় তাঁরা দেখেছেন যে আর–ই–এম–বহির্ভূত স্বপ্নের অধিকাংশ সাদৃশ্য চিন্তা প্রক্রিয়ার সাথে, স্বপ্নের সাথে নয় ; সেগুলো অনেক বেশি ধারণাসদৃশ (conceptual), সচেতন ইচ্ছের নিয়ন্ত্রণে বর্ণিত ; জাগরণে পূর্ণ চিন্তাই এসব স্বপ্নের সাথে অধিক তুলনীয়। এও হতে পারে যে, সমীক্ষাধীন ব্যক্তি হয়তো জাগরণের জন্যে সৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, ইত্যাদি উদ্দীপনার এবং বিবরণ–প্রদানের মধ্যবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছে। ফাউকেস্ এই সম্ভাবনার ধারণার প্রবক্তা। ক্রেমেন (Kremen) আবার বলেছেন যে সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদেরে প্রদত্ত পূর্ব–নির্দেশের ওপরও নির্ভর করে আর–ই–এম এবং আর–ই–এম–বহির্ভূত ঘুমে প্রাপ্ত স্বপ্নের পরিমাণের অনুপাত, প্রভাবিত হলে আর–ই–এম–বহির্ভূত সময়ে প্রাপ্ত স্বপ্নের পরিমাণ বেড়ে যায়। রেখ্‌ট–সাফেন, ভোগেল (Vogel) এবং সাইকুন (Shaikun) আবার বলেছেন যে, একই রাতের আর–ই–এম–বহির্ভূত স্বপ্ন এবং আর–ই–এম স্বপ্নের মধ্যে অনেক সদৃশ যৌন উপাদান রয়েছে। রেকট্‌সাফেন ব্যক্তিগতভাবে এও বলেছেন যে কখনো কখনো গভীর ঘুমের পর্যায়ে সাময়িক তথা সংক্ষিপ্ত স্বপ্ন

দেবার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক প্রমাণাদি নাকি বলে যে চোখের তারার ধীর ঘূর্ণন পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আর-ই-এম-এ রূপ পায়। সুতরাং এও সম্ভব যে একটি স্বপ্ন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং আর-ই-এম সময়েই চূড়ান্ত রূপ পেয়ে সংগঠিত ও দৃশ্যমান হয়। আর-ই-এম-বহির্ভূত সময়ের কিছু স্বপ্নের এ-ই নাকি ব্যাখ্যা।

ঘুমের ঘোরে কথা বলার ব্যাপারটিও নাকি প্রমাণ করে যে আর-ই-এম-বহির্ভূত ঘুমেও মস্তিষ্কের আংশিক জাগরণ ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে লেখক-গবেষকগণ এমন পর্যন্ত এটাই বলেছেন যে ঘুমের ঘোরে কথা বলাটা নিশ্চয় ঘুম এবং জাগরণের মধ্যেকার সীমান্ত সময়েই ঘটে থাকে। অন্যথায়, আংশিক জাগরণের ব্যাপারটাই সত্য। তাছাড়া, আর-ই-এম-বহির্ভূত তথা গভীর ঘুমে বলা কথা সাধারণত অর্থহীন, এবং সমীক্ষা তথা ঘুমের সময়কার পরিবেশ এবং দৈহিক অবস্থার সাথে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়। বিপরীতভাবে আবার এও দেখা যায় যে আর-ই-এম ঘুমে বলা কথার সাথে স্বপ্নের বিষয়ের সম্পর্ক থাকে। ইত্যাদি।

আর-ই-এম সময়ের আগে-পরে স্বপ্নদ্রষ্টার দৈহিক নড়াচড়া ঘটতে পারে, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে মানুষটি সচরাচর শান্ত থাকে, হাত কিংবা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট নড়াচড়াই শুধু সম্ভব। আর, আর-ই-এম চলাকালে যদি বড় দৈহিক নড়াচড়া ঘটেই, সমীক্ষাধীন ব্যক্তি জানায় যে হয় স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটেছে, কিংবা দেখেছে যে দুটো বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন।

আর-ই-এম-এ নিহিত স্বপ্ন মানুষ সাধারণত কখন দেখে? ইইজি এবং নড়াচড়ার পরিমাপ থেকে জানা যায় যে মানুষের নিদ্রাকালীন স্বপ্ন-জাগরণ বাড়ে এবং কমে। ইইজি-র ১নং পর্যায়েই আর-ই-এম ঘুমকে পাওয়া যায় (ক্লেইটম্যান গ্রুপ), এবং তখনই অধিকাংশ স্বপ্ন দেখা হয়। চেতন অবস্থার নিকটস্থ অত্যন্ত জাগ্রত অবস্থায়ও দেখা যায় কিছু স্বপ্ন। নিদ্রার অন্যান্য পর্যায়েও। তবে নিদ্রা যত একঢালা-সুগ্রথিত, স্বপ্ন তত কম। প্রকৃতপক্ষে, একটানা ঘুম এবং আর-ই-এম পর্যায় তথা স্বপ্নঘুম রাত জুড়ে পরপর চলতে থাকে। ডিমেন্ট এবং ক্লেইটম্যান দেখতে পান যে অব্যাহত ঘুমে ৯০-১০০ মিনিটের এক-একটি পর্যায়ের এক চক্রাকার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইইজি-

তে এক রাতে ৫০ বার ছোট পরিবর্তন ধরা পড়ে। তবে, এগুলো শুধুই দৈহিক নড়াচড়া, এবং ইইজি-র ১নং পর্যায়ে পৌঁছয় না। তবে ৬-৮ ঘন্টার কোনো ঘুমে আর-ই-এম-সংশ্লিষ্ট ইইজি-র বড়, দীর্ঘস্থায়ী উর্ধগতি ঘটে ৩-৬ বার। সেগুলোর সাথে থাকে বড় দৈহিক নড়াচড়া। স্বাভাবিক অবস্থায় আর-ই-এম চলে ৩ থেকে ৫০ মিনিট। রাতের শুরুতে আর-ই-এম সময় সাধারণত ছোট থাকে, রাত বাড়ার সাথে সাথে তা দীর্ঘ হয়। বিপরীতভাবে, একটানা ঘুম শুরু করার পর অর্থাৎ রাতের শুরুতে দীর্ঘতম হয়, পরবর্তী রাত জুড়ে চক্রের এককালীন ঘুমের অংশ হ্রস্বতর এবং অগভীরতর হতে থাকে।

১৯৬২ সালের এক পরীক্ষায় ডিমেন্ট দেখাতে পান যে, অন্ধ ব্যক্তিরা চোখের তারা ঘুরোতে সক্ষম হলেও ঘুমের মধ্যে তাদের কোনো আর-ই-এম ঘটে না। ইইজি-চিত্র তাদের ঘুমের মধ্যকার স্বাপ্নিক অবস্থাগুলোর প্রমাণ দেয়, কিন্তু সেসব স্বপ্ন দৃশ্যবস্তুভিত্তিক নয়। বার্জার (Berger et al. 1969), অফেনক্রানত্জ এবং ওলপার্ট (Offenkrantz and Wolpert, 1963) প্রমুখও এই তথ্য সমর্থন করেছেন। তার অর্থ কি দাঁড়ায়? যে, আর-ই-এম হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বপ্ন-প্রক্রিয়ার একটি বহির্দেশীয় (peripheral) প্রতিফলন মাত্র, শুধুমাত্র দৃশ্যকল্পের স্বপ্নেই তা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ব্যাপারটা প্রকৃতও তাই, আর-ই-এম সাধারণভাবে স্বপ্নের সাথে জড়িত বলে অনুমিত হলেও, দৃশ্যবস্তুভিত্তিক স্বপ্নের ক্ষেত্রেই আবশ্যিকভাবে ঘটে। তবে যেহেতু স্বাভাবিক ব্যক্তিদের অধিকাংশ স্বপ্নই প্রধানত দৃশ্যবস্তুভিত্তিক, সুতরাং আর-ই এম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিই। এখনও পর্যন্ত বর্ণিত দৈহিক উপসর্গ এবং আর-ইএমই হচ্ছে কেউ স্বপ্ন দেখছে কি দেখছে না, তার সার্বিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। এবং ইইজি ও আর-ই-এম পদ্ধতিতে এও জানা গেছে যে সকলেই, এমনকি যারা বলে যে তারা কখনো স্বপ্ন দেখে না, তারাও স্বপ্ন দেখে এবং আর ই এম ঘুমের সময় জাগানো হলে, স্বপ্নের বিবরণ দিতে পারে।

স্বপ্ন-দেখা দৃশ্য এবং আর-ই-এম-এর মধ্যে ধরনের-চরিত্রের প্রচুর মিল থাকে, বলেছি। ১৯৫৭ সালের এক পরীক্ষায় ডিমেন্ট এবং ক্লাইটম্যান দেখাতে পান যে চোখের তারার ওপরমুখী গতি যুক্ত ছিল মই বেয়ে ওপরে

ওঠার একটি স্বপ্নদৃশ্যের সাথে, আরোহণকারীও যেখানে ওপরে-নিচে তাকাচ্ছিলো। দু'মুখী গতির আর-ই-এম-এর সময় লোকটি স্বপ্ন দেখছিল যে দুটো লোক পরস্পরের দিকে টমেটো ছোড়াছুড়ি করছে। চোখের তারার গতির অনুপস্থিতি প্রমাণ করে এক দৃষ্টে দেখতে থাকা, কিংবা খুব দূরের কোনো কিছু দেখা। মিশ্র গতি সাধারণভাবে কাছাকাছি রয়েছে—এমন প্রাণী বা বস্তুর স্বপ্ন নির্দেশ করে। ডিমেন্ট এবং ওলপোর্ট বলেছেন যে চোখের তারার দ্রুত এবং বড় নড়াচড়া সক্রিয় স্বপ্নের আভাস, সেক্ষেত্রে ঈষৎ নড়াচড়া নিষ্ক্রিয় স্বপ্নের আভাস। স্বপ্ন যত সক্রিয়তাপূর্ণ, আর-ই-এম তত দ্রুত।

স্বপ্নের সময় মস্তিষ্কের তুলনামূলক জাগরণ এবং অধিক তৎপরতার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে মধ্যকর্ণের পেশিসমূহের সক্রিয়তা। আর-ই-এম-এর সময় কানের ওইসব পেশিও বিচ্ছিন্নভাবে এবং অনিয়মিত ধাক্কার আকারে নড়ে। এবং চোখ ও কানের পেশির সক্রিয়তার বিন্যাসে কিছু সাদৃশ্যও চোখে পড়ে, অথচ হয়তো তারা একই সময়ে ঘটে না, কানের পেশি কখনো-কখনো চোখের পেশির আগে কাজ শুরু করে। সমীক্ষাধীন কোনো কোনো ব্যক্তি বলেছে যে স্বপ্নে তারা কিছু শুনতে পেয়েছে এবং তখন মধ্যকর্ণের পেশির প্রচণ্ড সক্রিয়তাও দেখা গেছে, এবং স্বপ্নের শব্দ যদি (দেখার মতো করে) শোনাও হয়ে থাকে, তবে সেটা ঘটাই স্বাভাবিক।

স্বপ্ন-সময়ে মানুষের কি আংশিক জাগরণ ঘটে, না যায় সে ঘুমের আরো গভীরেই? ইইজি, মানসিক সক্রিয়তা, হৃদ্স্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্তন, ইত্যাদি রায় দেয় আংশিক জাগরণের পক্ষে। অপরপক্ষে, ত্বকের বর্ধিত প্রতিরোধ, দৈহিক নড়াচড়ার অনুপস্থিতি, বর্ধিত শ্রবণদ্বার, ইত্যাদি আভাস দেয় গভীরতর ঘুমের। স্নাইডার প্রমুখ গবেষক বিস্তারিত সমীক্ষায় দেখতে পান যে হৃদ্স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ, রক্তচাপ, ইত্যাদি ১-আর-ই-এম-এর সময় শুধু বাড়েই না, এদের ওঠানামাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ে, এবং স্বপ্নবিবরণের মানকে দেখতে পাওয়া যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামার সঙ্গে যুক্ত। জাগরণ-ব্যাপরের আরেক নির্দেশক/ পরিমাপক হিসেবে ফিশার, প্রমুখ দেখতে পান সকল বয়সের পুরুষের ক্ষেত্রে স্বপ্ন-সময়ে লিঙ্গের উত্থান। স্বপ্নের মিনিট খানেক আগে থেকে শুরু হয়ে এটা বজায় থাকে আর-ই-এম

শেষ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব স্বপ্নের কোনো যৌন বিষয়বস্তু থাকে না, লিঙ্গের উত্থানকে জাগরণ-ক্রিয়ারই অংশ মনে হয়।

জৌভেট (১৯৬১) বিড়ালের ক্ষেত্রে দেখতে পান telencephalic এবং rhombencephalic ঘুমের দুটো পৃথক পর্যায়—যারা যথাক্রমে পূর্বোল্লিখিত মন্থর ইইজি বিন্যাস এবং 'আপাতবিরোধী' ঘুমের সমানুবর্তী। জৌভেট অবশ্য এগিয়ে গিয়ে এও বলেন যে আপাতবিরোধী ঘুম গভীরতর ঘুম। এরূপ ধারণার একটি কারণ হলো আপাতবিরোধী ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করে নিম্নতর মস্তিষ্ককাণ্ড-ব্যবস্থা (lower brain stem mechanism)। আপাতবিরোধী ঘুমের সঙ্গে জড়িত মস্তিষ্ক-এলাকা নিম্নতর মস্তিষ্ককাণ্ডের কাছাকাছি, যারা কতোক ব্যবস্থাকে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় করে তোলে। ব্যাটিনি, প্রমুখ এবং উইলিয়াম্‌স্, প্রমুখের পরীক্ষায়ও আভাস পাওয়া যায়, আপাতবিরোধী তথা স্বপ্নঘুম এক ধরনের আংশিক জাগরণেরই ব্যাপার। পেশি-শিথিলতার ঘটনাটির ব্যাখ্যা সেক্ষেত্রে কি? ডিমেন্ট দেখেছেন যে, আর-ই-এম-সময়ে পেশির চাপ-টান একেবারেই থাকে না। বার্জারও দেখেছেন স্বপ্নের সময়ে স্বরযান্ত্রিক পেশির টান কমে যেতে। এইভাবে মস্তিষ্কের স্বপ্নব্যবস্থাসংশ্লিষ্ট পেশিগুলো উত্তেজনা-নিস্তেজনা দুই-ই ঘটতে দেখা যায়। নিস্তেজনা যে পূর্ণাঙ্গ নয়, তা প্রমাণ হয় গোফের আক্ষেপ এবং আভ্যন্তরিক আবেগী পরিবর্তনের বিরামহীনতা থেকে।

স্বপ্ন যে গভীরতর ঘুমেরই ফসল, তার আর একটি প্রমাণ হলো শ্রবণদ্বারপ্রান্ত স্বপ্নের সময়ে উচ্চতর। বিড়ালের ক্ষেত্রে শব্দের তীব্রতানির্ণয় সাধারণ মন্থর-তরঙ্গ-ঘুমের সময় কিছুটা কমে যায়, আপাতবিরোধী ঘুম তথা স্বপ্নের সময় তা কমে যায় অনেক বেশি। অপরপক্ষে, শ্রবণসংকেতে গুরুমস্তিষ্কের সাড়াপ্রদান বানর এবং মানুষের ক্ষেত্রে জাগরণ এবং আর-ই-এম ঘুমের সময়ে একই রকম, যা স্বপ্নের সময়কার আংশিক জাগরণের ধারণাকেই সমর্থন দেয়। আডে, কাডো এবং রোড্‌স্ (Adey, Kado and Rhodes, 1963) অবশ্য দেখেছেন যে স্বপ্নের সময় শ্রবণদ্বারপ্রান্তের উচ্চতা বাড়ে না। আর, ডিমেন্ট, ক্রেইটম্যান এবং স্নাইডারের অভিমত হলো : বর্ধিত

শ্রবণদ্বারপ্রান্ত হলো স্বপ্নরূপকল্পে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার ফল। স্বপ্নদ্রষ্টা এতই মগ্ন যে বাইরের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। মস্তিষ্কের খোপখোপ কিংবা জালের মতন গঠনের দিক থেকেই অপ্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরমুখী উদ্দীপকের ওপর একটি নিবৃত্তকারী প্রভাব পড়ে। ক্লেইটম্যানের ধারণা হলো, স্বপ্নসময়ে ঘুমের একটি জাগরিত অবস্থা ধরা পড়ে যে ইইজি-তে, গুরুমস্তিষ্কের সক্রিয়তার সেটাই চূড়ান্ত মাপকাঠি। অর্থাৎ, স্বপ্ন হচ্ছে গুরুমস্তিষ্কের এবং স্বায়ত্তশাসিত জাগরণসংবলিত সুগভীর ঘুম, কিংবা তা হচ্ছে এক সুগভীর অভিনিবেশসংবলিত ঘুমের এক জাগ্রত পর্যায়।

ঘুমের স্বপ্নপর্যায় তাই চমৎকার কিছু জটিলতাকে উপস্থিত করে। মস্তিষ্ক এবং স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুব্যবস্থা জাগ্রত হয়, কিন্তু, কিছু পেশিগুচ্ছে দেখা যায় হ্রাসপ্রাপ্ত চাপ-টান। গুরুমস্তিষ্কের ঐ জাগরণ আবার ঘটে প্রত্যঙ্গগত (limbic) ব্যবস্থার মাধ্যমে, মস্তিষ্কজালের সক্রিয়করণ ব্যবস্থার (reticular activating system) মাধ্যমে নয়। নিম্নতর মস্তিষ্ককাণ্ডব্যবস্থা একে নিয়ন্ত্রণ করে। একই কাঠামোসমূহকে উদ্দীপিত করে পাওয়া যায় সুসমন্বিত (synchronized) এবং জাগরিত (aroused)—এই দুই ঘুমকেই। এক অজানা প্রক্রিয়ায় সুসমন্বিত ঘুম পৌঁছে যায় জাগরিত ঘুমে। এর অনন্য সব বৈশিষ্ট্য থেকে জোর যুক্তি পাওয়া যায় যে, স্বপ্ন-পর্যায়িক জাগরণ কোনোভাবেই সরল, এককধর্মী কোনো জাগরণ নয়, সতর্ককৃত, প্রেষণাধর্মী কোনো অবস্থাও তা নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এটা মনে হয় না যে স্বপ্ন অমিমাংসিত চাপের সৃষ্টি, কিংবা ঘুমের প্রহরী তা। ঘুম-প্রেষণার দিকনির্দেশক বৈশিষ্ট্যাদি রয়েছে বটে, কিন্তু, সাধারণ শক্তিসঞ্চারক তা নয়। ব্যক্তিত্ব-অভিযোজন এবং মানসিক স্বাস্থ্যে ঘুমের জড়িত থাকাটা এও আভাস দেয় যে যৌনতা এবং আগ্রাসন মনোবৈকল্যের কোনো আবশ্যিক ভিত্তি নয়।

এছাড়াও যেটা ঘটে তা হচ্ছে, স্বপ্নের সময়ে গোটা দেহের ক্ষুদ্রাকার পেশিগত কাজকর্ম এবং স্বপ্নের বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ। পেশির ওপরকার চামড়ায় ইলেকট্রোড সেঁটে রেখে', পেশি-এলাকায় বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করে এটা জানা গেছে। সমীক্ষাধীন একজন বলেছেন যে স্বপ্নে তিনি

দু'জন বেস্‌বল খেলোয়াড়কে খেলার জন্যে শরীর তাঁতিয়ে নিতে দেখছিলেন, এবং সেই স্বপ্নের মধ্যে তার দেহের পেশিসমূহও প্রায় একই গতিপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, যদিও তা ছিল অনেক কম মাত্রার। দ্বিতীয় একজন স্বপ্নদ্রষ্টার ডান হাত থেকে বাম হাতে এবং শেষ পর্যন্ত পায়ে চলে গেছে একপ্রকার বিদ্যুৎক্রিয়া। জাগানো হলে সে বলেছে যে সে স্বপ্ন দেখেছে যে সে ডান হাত দিয়ে একটি বালতি তুলে বাম হাতে নিয়েছে এবং তার পর হাঁটতে শুরু করেছে। ডঃ স্নাইডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ-এ সযত্নে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, স্বপ্নের সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, দেহতাপ, ডানহাতের মধ্যমায় নাড়ীর স্পন্দন এবং হাতের চামড়ার তাপ, ইত্যাদি প্রচণ্ড সক্রিয়তা প্রদর্শন করে, যার পরিমাণ কখনো-কখনো জাগ্রত অবস্থারও অধিক। রাত্রি গভীর হতে থাকে, এই সক্রিয়তাও বাড়ে—তৃতীয় স্বপ্ন পর্যন্ত এইরূপ চলে এবং ভোরবেলার দিকে এটা কমে আসে। এবং স্বপ্নে দেখা কাজকর্মের ঘটনাপ্রবাহের সাথে তাল মিলিয়েই এই সক্রিয়তা বাড়ে কিংবা কমে। স্বপ্নের আবেগী উপাদান দৈহিকভাবে উপলব্ধ হয়, এবং শারীরিক সক্রিয়তার তারতম্যের মাধ্যমে প্রকাশিতও।

শুধু স্বপ্ন নয়, ঘুমকেও এক ধরনের সক্রিয়তা বলা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, মস্তিষ্কে স্বপ্নবর্জিত, মন্দতরঙ্গ ঘুমের প্রয়োজনও তৈরি হতে এবং বাড়তে থাকে। এ যেন রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই পরিস্থিতিই : 'বিশ্রাম কাজের অঙ্গ/এক সাথে গাঁথা/...', ইত্যাদি। স্বপ্নের সক্রিয় প্রকৃতি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা স্বপ্নের স্মৃতিভিত্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূল যুক্তিটি এই যে, দিনের বেলায় সংগৃহীত নতুন তথ্যাদি ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতায় আরো সন্তোষজনকভাবে অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন, যেন সেই নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা তাকে নতুন গতিমুখ দিতে পারে। এই নতুন গতিমুখ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন হয় নতুন ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির স্মৃতিভাণ্ডারের তুলনার, যে-স্মৃতির রয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বনির্ধারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর, সেই তুলনা অর্জিত হয় স্বপ্নসময়ে, পশ্চাৎপট হিসেবে অতীত স্মৃতিকে রেখে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে। এর ফলে

সর্বশেষ ঘটনার আলোকে অতীতকে নতুন করে বিচার করে দেখা সম্ভব হয়—যেন বর্তমানের উপযোগী করে অতীতের পুনর্লিখন, এবং অতীতের আলোকে বর্তমানের পুনর্বিচার। এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রথমে সামনে আসে অধিকতর সাম্প্রতিক স্মৃতি, এবং স্বপ্ন চলতে-চলতে, অপেক্ষাকৃত ঐতিহাসিক স্মৃতিও উদ্ভাসিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত যখন আদিতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়েছে এবং নতুন বিষয়সমূহের ওপর তাদের প্রভাব জানা, ধারাবাহিকভাবে বর্তমানে প্রত্যবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, অতীত ও বর্তমানের পুনর্বিচারের সঙ্গে-সঙ্গে। স্বপ্নযোগে তথ্যের পুনার্ধ্যায়নের এই ধারণা স্বপ্ন সম্পর্কে 'সেফটি ভাল্ভ' তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ, ঐ কাজটি করার সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্ন তথ্যের পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। কর্টেক্সে অনঙ্গীভূত তথ্যের চাপ জমে ওঠার ফলে এবং সূত্রেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিভাবে জমা হয় স্বপ্নঋণও।

রেটিকিউলার সক্রিয়করণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণসূত্রেই মানুষ ঘুমোয়, এই নিয়ন্ত্রণের-ক্ষেত্রে-দায়িত্বশীল মগজ–অংশ নষ্ট হয়ে গেলে ঘুম কমে যায় কিংবা যায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে। এবং এই যুক্তিতেও বলা হয়েছে যে ঘুম এবং স্বপ্ন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। সেরেবেলামের দু' অর্ধেকের মধ্যে সাঁকো হিসেবে ক্রিয়াশীল পন্‌সের (pons) মগজের একটি উপযোগী অংশ নষ্ট হয়ে গেলে আপাতবিরোধী তথা স্বপ্নঘুম মার খেয়ে যায় ; পন্‌স্ এবং মস্তিষ্ককাণ্ডের (brainstem) অপর এক মগজ অঞ্চল চলে গেলে দেখা দেয় সম্পূর্ণ অনিদ্রা। তাছাড়া, স্বপ্নঘুমকেন্দ্র গঠিত নোরাড্রেনালিন (noradrenalin) নামক এক রাসায়নিক বস্তুসম্পন্ন স্নায়ুকোষ দ্বারা ; অপরপক্ষে, মন্দরতরঙ্গ ঘুমকেন্দ্রে থাকে সেরোটোনিন (serotonin)। এ দুটো রাসায়নিক দ্রব্যের বৃদ্ধিতে দু'ধরনের ঘুম যে বেড়ে যায়, তাতেও প্রমাণ হয় যে এরা দুই ভিন্ন ধরনের ঘুম। আমাদের জন্যে আরো প্রাসঙ্গিক তথ্য হচ্ছে এটা যে স্বপ্নঘুমের সময়ে একই সঙ্গে চলে কর্টেক্সের অব্যবহিত নিচে স্মৃতিভাণ্ডারের সম্ভাব্যস্থানে সুসমন্বিত বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড (synchronous electrical activity)। স্বপ্ন সম্পর্কে স্মৃতিভাণ্ডারভিত্তিক তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের পক্ষে এটা একটি নিশ্চিত প্রমাণ।

এইভাবে ঘুমকেও এক সক্রিয়তা এবং স্বপ্নকে সৃজনশীল এক কর্মকাণ্ড হিসেবে যারা ব্যাখ্যা করেছেন, সেক্ষেত্রে স্বপ্নের সবলতা-দুর্বলতা, অর্থাৎ কতোক বৈশিষ্ট্যও তারা নির্দেশ করেছেন। তুলনা করে প্রথমে তারা বলেন যে 'স্বপ্নের উৎস এবং ভিত্তি হচ্ছে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত সঞ্চিত সকল তথ্য, জ্ঞান, ধারণা, চিন্তা। অপরপক্ষে, সচেতন চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে মস্তিষ্কে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান এবং চিন্তারত অবস্থায় বহির্জগত বা বাস্তব জগত থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি — সেটা কোনো দৃশ্য হতে পারে, কোনো কথা বা বক্তৃতা ... অথবা কোনো লিখিত রচনা ... ।' প্রাথমিক এই তুলনাটি থেকেই বেরিয়ে আসে আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

১. 'মস্তিষ্কের যে অংশে বা স্তরে সচেতন চিন্তা সংঘটিত হয় এবং সচেতন ভাবলব্ধ তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে, সেই একই স্তরে স্বপ্ন-সম্পর্কিত প্রক্রিয়া এবং বিষয়াদি অবস্থান করে। কারণ, অন্যথায়, স্বপ্ন দেখার সময়ে মানুষের মস্তিষ্কের স্বপ্নসংশ্লিষ্ট অংশ অনায়াসে মস্তিষ্কের সচেতন স্মৃতির অংশে বিচরণ করতে পারত না।'

২. 'স্বপ্নের জন্য নির্ধারিত স্থানে... স্বপ্নের স্মৃতি... রক্ষিত হয়। এ-কারণেই ঘুম ভাঙার পর অনেক সময় কোন সূত্র ধরে স্বপ্নের কথা স্মরণ করা যায়। ঘুম ভাঙার পর যদি স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, তবে তা সচেতন স্মৃতির জগতে স্থান লাভ করে এবং স্বপ্ন হিসাবেই সচেতন স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়, বাস্তব ঘটনা হিসাবে নয়।'

৩. '... দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে স্বপ্নকে স্মরণ করা যায় না। ... সচেতন স্মৃতির ক্ষেত্রে দূর অতীতের ঘটনাও স্মরণ করা সম্ভব ; যদি উপযুক্ত সূত্র অবলম্বন করা হয়।'

৪. 'স্বপ্নে যৌক্তিকতা রক্ষিত হয় এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অপরপক্ষে, সচেতন চিন্তাতেও অযৌক্তিক ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটে এমনটা সর্বদাই দেখা যায়।... স্বপ্নে অনেক ক্ষেত্রেই যৌক্তিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে বলে স্বপ্নে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।

বিজ্ঞানী ও গণিতবিদগণ স্বপ্নের মধ্যে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। সাধারণ মানুষও প্রাত্যহিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান স্বপ্নের মধ্যে আবিষ্কার করেন।'

৫. 'স্বপ্ন প্রক্রিয়ার বিচরণক্ষেত্র ও এক্তিয়ার সচেতন চিন্তা জগতের চেয়ে বেশি। স্বপ্ন তার উপাদান সংগ্রহ করে সচেতন স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু সচেতন চিন্তা স্বপ্নের স্মৃতিভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে না। স্বপ্নপ্রক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক এবং অবাস্তব ভাবনাকে প্রশ্রয় দান করে, কিন্তু, এ-কারণেই আবার স্বপ্নের পক্ষে নানা জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ এবং সম্ভবপর হয়। সচেতন চিন্তা প্রক্রিয়া নানা প্রকার বিধিনিষেধ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। যৌক্তিকতা এরকম একটা বাধা —কারণ যুক্তি সর্বদা সত্য হয় না, যুক্তি সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটে, এবং ফলত যুক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বিভিন্ন যুগে সচেতন চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অপরপক্ষে, স্বপ্ন কোনো যুক্তির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না বলে তার পক্ষে নতুন ধারণার পথ উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়। আরও অনেক চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা আমাদের সচেতন চিন্তার জগৎকে সীমিত, পঙ্গু ও বাধাগ্রস্ত করে রাখে। যেমন, আদর্শগত ধারণা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ, দলগত স্বার্থচিন্তা, জাতীয় স্বার্থের চিন্তা, ইত্যাদি আমাদের সচেতন চিন্তাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু, স্বপ্নের জগতে এ সকল চিন্তাভাবনা খুব বেশি কঠোরভাবে কার্যকর হয় না। এ-কারণে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ অনেক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে, যা সচেতন চিন্তার সাহায্যে হয়ত সম্ভব হত না — কারণ, সচেতন চিন্তা অনেক বিধিনিষেধের দ্বারা, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে হয়ত সত্যকে দূরে ঠেলে দেয়। অনেক বিজ্ঞানী যে স্বপ্নের মধ্যে সমস্যার সমাধান করেন, তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে, তারা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রচলিত ধারণাকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে

> চিন্তা করেন। একজন বিজ্ঞানী একদা সকল বৈজ্ঞানিককে সম্বোধন করে বলেছিলেন : ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যথাযথ-ভাবে স্বপ্ন দেখার অভ্যাস করুন। উল্লেখ্য যে এই বিজ্ঞানী স্বপ্ন থেকে ইঙ্গিত লাভ করে বেনজিন-এর অণুর গঠনবিন্যাস আবিষ্কার করেছিলেন।

স্বপ্নের আশাব্যঞ্জক তথা ইতিবাচক ভূমিকা মানুষের ব্যাপকভাবে স্বপ্ন-ভুলে-যাওয়া সত্ত্বেও শুধু নয়, স্বপ্ন-ভুলে-যাওয়ার কারণেই না-কি আরো বেশি সত্য। স্মরণে তথা সচেতন বিবেচনায় এসে যাওয়ার ফলে নাকি স্বপ্নের তৃপ্তিকর-সুখকর তথা গতিসঞ্চারী-যাদুকরী ভূমিকাটি ক্ষুণ্ণই হয়। স্বপ্নের সক্রিয় তথা সৃজনশীল চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষের ইতিহাসযাত্রায় স্বপ্নের উদ্ভব-ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে নিম্নরূপও :

> 'স্বপ্ন দেখার প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হয়েছিল তখনই যখন মানুষের মস্তিষ্কের গঠন বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছিল। আদিম শিকারী যুগে মানুষ যখন বড় বড় পশু শিকার করতে শুরু করেছিল তখন মানুষকে শিকারের হাতিয়ার তৈরি করা, শিকারের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ করতে হত এবং এ সব কাজ সাধনের জন্য চিন্তাও করতে হত। কিন্তু আদিম শিকারী মানুষ সারাদিন শিকারের কাজে পুরোপুরি নিমগ্ন থাকত, তখন চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। তাই রাতে ঘুমের মধ্যে চিন্তা করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হল—মস্তিষ্কের গঠন সে অনুযায়ী বিন্যস্ত হল। এই ঘুমের মধ্যে চিন্তা করার প্রক্রিয়াই স্বপ্ন। আদিম শিকারী মানুষ যে স্বপ্ন দেখার প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল আজকের দিনের মানুষ তা বংশগতির ধারায় জন্মসূত্রে লাভ করে থাকে।'

স্বপ্নের উদ্ভব-ইতিহাস সম্পর্কে এমন সব সংগ্রামপ্রত্যয়ী তথা জীবনঘনিষ্ঠ ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এফ.টি. মিখাইলভ তার *দ' রিড্‌ল্ অব্ দ' সেল্ফ* বইয়ে, একটি স্বপ্ন-বিবরণ শেষে, (পৃ. ১৪৬) দাবী করেন যে সেই স্বপ্নটির অনুভব ও সংবেদনসমূহের কাছে তিনি সারা জীবনই ফিরে-ফিরে যাবেন, যেন তারা অতীতের বাস্তব ঘটনাই, সেই 'অতীত' যা বর্তমানের যে

কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে বর্তমান, এবং যা সর্বদাই নতুন-নতুন ধারণাকে আত্মীকরণ করে নিতে থাকে এবং তাদের অর্থের প্রতি জানাতে থাকে প্রতিক্রিয়া। মিখাইলভ উত্থাপন করেন আরও গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন : 'আমরা জেগে গিয়ে স্মরণ করতে ব্যর্থ হই যে সব স্বপ্নকে, ব্যক্তি কিংবা তার অহং কি তাদেরকে বাস্তবেই ভুলে যায়?' মিখাইলভ বলেন, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের সব ধারণা যদি ব্যক্তির প্রত্যক্ষকরণের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাদের বিভ্রান্তিকর প্রকৃতি যদি প্রদর্শিত হয় এভাবে যে, আমাদের স্বপ্ন কখনো কখনো হয়ে পড়ে জাগ্রত জীবনের সাধারণ ঘটনার তুলনায় জীবন্ত, সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, তখন তো বাস্তব থেকে স্বপ্নকে পৃথক করে চিনে নেয়ার প্রশ্নটা হয়ে পড়ে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, সবটা অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন নিয়ে এগিয়ে যারা প্যারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে ব্যক্তির অব্যবহিত ইন্দ্রিয়গত যোগাযোগের মনোস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকেই মানুষের জ্ঞানার্জন-উৎসের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিবরণ হিসেবে গণ্য করেন, তাদের জন্যে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করে একটি মৌলিক বিতর্ক। এক মুহূর্তের জন্যেও যদি আমরা মানুষ এবং মানবিক চেতনা বিষয়ে অভিজ্ঞাতাবাদী মনোভঙ্গীর সঙ্গে একমত হই, তাহলে এফ.টি. মিখাইলভের সেই কুর্শস্কায়া বালুতীরের জীবন্ত-বর্ণিল স্বপ্নবিবরণটি, বিপরীতভাবে, পরিণত হয় বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রতিপাদ্যের সমর্থক এক জোরালো যুক্তিতে—রাসেল বলেছিলেন, "জীবন একটি স্বপ্নের মতন।' তখন আর কে কি ভাবে প্রমাণ করবে যে, আমাদের বুদ্ধির অনুগত জাগ্রত জীবন আমাদের সৃজনশীল স্বপ্নের সৃজনশক্তিতে এবং অবচেতনের উপাদানে গঠিত স্বপ্ন-প্রতিচ্ছবিগুলোর জীবন্ত ও শক্তিশালী অভিজ্ঞতার তুলনায় অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ—আমাদের আত্মার জন্যে, চিত্তের জন্যে, বিশ্ববীক্ষার জন্যে? সর্বোপরি এটা সত্য। কারণ, জাগ্রত অবস্থায় মিখাইলভ কখনোই কুর্শস্কায়া-স্বপ্নের অভিযান-কাহিনীর সদৃশ কোনো কিছুই ভাবতেন না। রাসেলেরও তাই বক্তব্য যে, একটি স্বপ্নও জীবন, ভুলে-যাওয়া-সম্ভব জীবন, আমাদের গ্রহে জন্ম-নেয়া এবং মরে-যাওয়া সব ব্যক্তিজীবন যেরূপ অনিবার্যভাবেই হারিয়ে যায়। *হিউম্যান নলেজ* বইয়ে রাসেল এরূপ যা বলেন, স্বপ্নে সৃজনশীল অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন,

এমন প্রত্যেকেই তার সাথে একমত হবেন। স্বপ্নও জীবন, এর অবিভাজ্য অংশ, মানুষের সকল সচেতন কাজের অনুরূপ ভিত্তি দ্বারাই তা নির্ধারিত।

স্বপ্ন-চলাকালীন সময়ে মস্তিষ্কের আংশিক জাগরণ ও তৎপরতার যেসব প্রমাণিত বাস্তব দৈহিক প্রমাণ, সেই এক মুদ্রার উল্টো পিঠই বুঝি স্বপ্ন-চলাকালে সৃষ্ট বাহ্যিক উদ্দীপনার স্বপ্নের বিষয়কে প্রভাবিত করার সত্য। জন জি টেলর জানিয়েছেন, উত্তপ্ত বোতলের ওপর পা রেখে ঘুমিয়েছিল, এমন এক ব্যক্তি জানায় যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে মাউন্ট এটনায় আরোহণ করেছেন, অত্যন্ত উত্তপ্ত সেখানকার ভূ-ভাগ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডিমেন্ট এবং ড. ওলাপার্ট সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদেরকে 'সি' সুর পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন, সরাসরি তাদের মাথার ওপর ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, সিরিঞ্জযোগে হাত ও পায়ের ওপর ঠাণ্ডা পানির ধারা ছিটিয়েছিলেন। যখন আর–ই–এম এবং দ্রুত মস্তিষ্ক তরঙ্গ চলছিল না, তখন কিন্তু এরূপ কোনো আয়োজনই স্বপ্ন সৃষ্টি করে নি, আর–ই–এম, ইত্যাদির পূর্বাপর অনুপস্থিতিতে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু, স্বপ্ন–চলাকালে যখন এর যে কোনো একটি উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হলো, চলমান স্বপ্নের বিষয়ের মধ্যে কখনো–কখনো তা গ্রথিত হলো। সুর স্বপ্নে ঢুকে পড়ে' সৃষ্টি করলো ভূমিকম্পের কিংবা "নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মতন শব্দ"। জলের ধারা স্বপ্নে ঢুকে সৃষ্টি করলো আকস্মিক বৃষ্টি কিংবা ছিদ্রযুক্ত ছাদের দৃশ্য, অপরপক্ষে, আলো স্বপ্নে নিয়ে এলো আগুন, বিদ্যুৎঝলক কিংবা অনুরূপ কিছু। দেহাভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার বেলায়ও একই ব্যাপার সত্য, তবে প্রতিফলন হয়তো অতটা জোরদার কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, গোটাদিন পানি বা তরল কোনো কিছু পান না করে এবং তদুপরি নোনা কাজু বাদামের মতো পিপাসা–উদ্রেককারী বস্তু খেয়ে ঘুমোতে যাবার পরও সমীক্ষাধীন ব্যক্তিরা স্বপ্নে শুধু অন্যদেরকে পানি, দুধ কিংবা অন্য তরল পদার্থ পান করতে দেখেছে, নিজেরা পান করছে সরাসরি এমন স্বপ্ন কেউ দেখে নি।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাহ্যিক কিংবা দেহাভ্যন্তরীণ কোনো উদ্দীপনাই প্রতি রাত্রের স্বপ্নের অবিচল চক্রকে পরিবর্তিত করতে পারে না। সম্ভব হয় শুধু বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করা। এবং সে–সত্যের

স্বাভাবিক যুক্তিতেই কিন্তু এও বলা হয়েছে যে শরীরেরই জন্যে শুধু স্বপ্নের এক ধরনের প্রয়োজন রয়েছে, জৈবিক প্রয়োজন। (ফ্রয়েড-কথিত ঘুমকে রক্ষা করা, টেনশান মোচন, ইত্যাদি মনোস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন নয়।) ১৯৬০ সনে নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ড. উইলিয়াম ডিমেন্ট এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটি এভাবেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন : আমরা ঘুমোবার জন্যে স্বপ্ন দেখি, না স্বপ্ন দেখার জন্যে ঘুমোই। ডিমেন্ট প্রথমে তাঁর স্বেচ্ছাসেবীদের অনেকগুলো রাতের জন্যে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের স্বাভাবিক ঘুম ও স্বপ্নের সময়ের গড় পরিমাণ তিনি জানতে পারেন। তারপরে আর-ই-এম লক্ষ্য করে-করে স্বপ্ন শুরু হতেই ডিমেন্ট তাদের জাগিয়ে দিতে লাগলেন ; বাদবাকি সময়ে আবার তাদেরকে ঘুমোতেও দিলেন। এইভাবে কয়েক রাত চললো, সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদেরকে দিনের বেলায় ঘুমোতে দেওয়া হতো না, কেননা, তাতে করে তারা অজানা একটা পরিমাণ স্বপ্ন দেখে নিতে পারে। সমীক্ষাধীন একজন তো তিন দিনের মাথায় পালিয়েই গিয়েছিলেন, চার রাতের পর দু'জন স্বেচ্ছাসেবী অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। সাহসী একজন অবশ্য সাত রাত যাবৎ স্বপ্নবঞ্চনা সহ্য করে গেলেন। প্রতিবার জাগানোর পরে সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদেরকে বসে থেকে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় কয়েক মিনিট কাটাতে বলা হতো, এর ফলে স্বপ্নের আবেশ-আবেগ পুরোপুরি চলে যেত। ঘুমে ফিরে গেলে, তখন তা শুরু হতো পুনরায় হ্রস্ব স্পন্দনের ইন্দ্রি-ঘুমযোগে। তবে স্বপ্নবঞ্চনার কয়েকদিন পর থেকেই দেখা যেত সমীক্ষাধীনগণ ঘুমে ফিরে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব আবার স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছে। ফলে তাদেরকে বার বার জাগাতে হচ্ছিল, এবং এক বেচারাকে শেষ পর্যন্ত তিরিশবার জাগাতে হয়েছিল। স্বপ্নবঞ্চনা পূরণ করে নেয়ার জন্যেই নিশ্চয় লোকগুলো এরূপ আচরণ করছিল। এবং স্বপ্নবঞ্চনার সময়কাল শেষ হলে স্বেচ্ছাসেবীদের যখন নিরুপদ্রবে ঘুমোতে দেওয়া হলো, এবং তাদের স্বপ্নের সময় তখনও পরিমাপ করা হতে থাকলো, তখন দেখা গেল যে স্বাভাবিকের এক-তৃতীয়াংশ অধিক পরিমাণ সময় তারা স্বপ্ন দেখে পার করছে। এই বর্দ্ধিত পরিমাণ সময় স্বপ্ন দেখাটা চলতে থাকে আপাতত দৃষ্টিতে ত রাত

ধরে, যতো রাতে স্বপ্নের ঘাটতি পরিমাণটা পূরণ করে নেয়া সম্ভব। তারপর আবার স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের স্বপ্নের স্বাভাবিক পরিমাণে ফিরে গেল। এক্ষেত্রে আবার এও লক্ষ্য করা গেছে যে বঞ্চনাপূরণের সময়কালে নিদ্রাভঙ্গটা ঘটে স্বপ্নবহির্ভূত সময়ে। ইতঃপূর্বেকার জাগরণের সংখ্যা এবং সময়কাল পূরণ হয় স্বপ্নবহির্ভূত জাগরণের দ্বারা। বঞ্চনাপূরণের ফলে স্বপ্নচেষ্টার সংখ্যা কিংবা স্বপ্নসময়ের পূর্বাপর মোট পরিমাণ-কোনোটাই বাড়ে না। অর্থাৎ, বর্দ্ধিত স্বপ্নের মাধ্যমে পূরণ ঘটে জাগরণের ক্ষতির নয়, শুদ্ধ স্বপ্নের ক্ষতিরই।

ড. উইলিয়াম ডিমেন্টের সমীক্ষার ফলাফল স্নাইডার-হোয়েডেমেকার, প্রমুখের গবেষণায়ও সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। জাগরণের ক্ষতিই যে মূল ব্যাপার নয়, এ্যাম্ফেটামাইন ঔষধটি প্রয়োগ করেও তা প্রমাণ করা গেছে। ঔষধের সাহায্যে মানুষকে না জাগিয়েই তার আর-ই-এম সময়কাল কমানো যায়, ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করার পরই ঘটে স্বপ্নের ক্ষতিপূরণকারী বৃদ্ধি। ডিমেন্ট আরো দেখতে পেয়েছিলেন যে স্বপ্নবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে উদ্বেগ, মনোযোগ-সমস্যা, তিরিক্ষি মেজাজ, ইত্যাদি দেখা দেয়। দেখা দেয় নাকি খাওয়ার রুচির বৃদ্ধিও। অন্যান্য ধরনের আবেগজনিত সমস্যাও। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও নাকি এরূপই ঘটে। এতোসব অবশ্য অন্যান্যদের গবেষণায় ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয় নি। তাছাড়াও, ডিমেন্টের সমীক্ষাতেই এটাও দেখা গেছে যে, স্বপ্নবঞ্চনার ক্ষতিপূরণকালেও ৭৭% সময় কাটে স্বপ্নহীন ঘুমেই। বার্জার, অস্‌ওয়াল্ড, উইলিয়াম্‌স্ প্রমুখ দেখেছেন যে নিদ্রাবঞ্চনার পরবর্তী প্রথম রাতে অধিকাংশ সময় কাটে স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে, স্বপ্নের সময় যায় কমে। তারপরের রাতগুলোতে অবশ্য স্বপ্নসময়ের পরিমাণ বাড়ে। তবে, বার্জারঅসওয়াল্ড বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণের বেলায় ঘুম যে পরিমাণে বাড়ে, স্বপ্ন ততোটা নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এমন কথা নিশ্চয় বলা যাবে না যে, আমরা স্বপ্ন দেখার জন্যেই ঘুমোই। স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা এবং স্বপ্ন—এ দুটো হয়তো ভিন্ন ভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয়। ঘুমকে চার ঘন্টায় সীমিত রেখে একটি পরীক্ষা চালিয়ে ডিমেন্ট দেখেন যে পরবর্তী রাতগুলোত স্বপ্ন এবং ঘুম—দুই-ই বেড়ে গেছে। মধ্যিখানে ঘুম আসার-সময়কাল এবং ঘুমের দ্বিতীয় পর্যায় গেছে কমে। গভীর ঘুমের স্বতন্ত্র প্রয়োজনও প্রমাণিত হয়েছে এ্যাগ্নিউ,

ওয়েব এবং উইলিয়াম্‌স্‌-পরিচালিত একটি সমীক্ষায়। সুতরাং, ওই কথাই ধোপে টেকে যে, নিজস্ব ভিন্ন-ভিন্ন প্রয়োজনে স্বপ্ন ও ঘুম দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ, এদের ভূমিকা হয়তো পরস্পর নির্ভরশীলও, কিন্তু এদের কেউ যে ঠিক অপরের জন্যেই আসে, তা নয়।

স্বপ্নের প্রয়োজনের প্রশ্নে কামেচ্ছা পূরণ, প্রেষণাকে মুক্ত করা, ইত্যাদি যে সব মনোস্তাত্ত্বিক ভূমিকার কথা আধুনিক ভাববাদী তথা ফ্রয়েডপন্থীরা বলেছেন, সেই ধারাতে এগিয়েই ড. চার্লস ফিশারের মতোন ব্যক্তিরা এরূপ বলেছেন যে স্বপ্নে 'ওরাল লিবিডোর' বাসনা পূর্ণ হয় বলেই স্বপ্নবঞ্চিতরা অতিভোজনের স্পৃহায় ভোগে। তাদের মানসিক অসুস্থতার মূলেও থাকে লিবিডোতৃপ্তির অভাব, ইত্যাদি। স্বপ্ন নাকি প্রতিরাতে আমাদের নিঃশব্দে নিরাপদে উম্মত্ত হতে দিয়ে দিনের বেলায় উম্মত্ত হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা করে। তবে, এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রেরই আর এক দল গবেষক। এই সূত্রে তারা স্বপ্নের খুব বড় একটা ভূমিকার কথাও বলেছেন। বলেছেন তারা, স্বপ্ন না দেখলেই বরং মানুষের নৈশ উম্মত্ততা দেখা দিত। সেটা কি রকম? এখানে এসে অবশ্য ইভান পেত্রভিচ পাভলভের অভিমত মিলে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গবেষকদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের স্যাথে। সকল ইন্দ্রিয়যোগে একটি বিরাট সংখ্যক উদ্দীপক যদি মস্তিষ্কে পৌঁছুতে থাকে, তাহলে ফলাফল অনেকটা উম্মত্ততার মতোই দাঁড়ায়, মানসিক অস্থিরতা, ভাবনার অসঙ্গতি, ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু এর উল্টোটা যদি ঘটে? ইন্দ্রিয়গুলো যদি মস্তিষ্কে কোনোরকম উদ্দীপনাই না পাঠায়? সে অবস্থায়ও মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেবে। পাভলভ অনেক আগেই এটা আবিষ্কার করেছিলেন যে 'ল্যাক অব ইনপুট'-এর সেই কম্পিউটার-পরিস্থিতিতে মস্তিষ্কের টোন বজায় থাকবে না। পরবর্তীতে মানুষের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও সমীক্ষা চালিয়ে অন্য স্বপ্নগবেষকরাও উদ্দীপনার অভাবজনিত মস্তিষ্কাবস্থার কমবেশি সম্পূর্ণ ও সঠিক চিত্র পেয়েছেন। জেট প্লেনের পাইলট এবং দূর-পাল্লার ট্রাক-ড্রাইভার থেকে শুরু করে গুহাবাসী সাধু-সন্ন্যাসী—একঘেয়ে পরিবেশে উদ্দীপনাবঞ্চিত সকল ধরনের সমীক্ষার্থীর বেলায়ই দেখা গেছে, সংবেদনবঞ্চনার ফলে কিছুকাল পরেই সকলে

নানারকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছেন, নানারকম শব্দ শুনেছেন, এবং উদ্ভট সব কল্পনা, কল্পদৃশ্য তাদের মাথায় এসেছে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে সংবেদনবঞ্চিত ব্যক্তি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদের মূলত তো একই অবস্থা—দু'দলের মস্তিষ্কেই ন্যূনতম সংবেদনে পৌঁছয়। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবেদনসঞ্চিত এবং ঘুমন্ত–স্বপ্নাবিষ্ট মানুষদের একইরকম ইইজি–চিত্র পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সংবেদনবঞ্চিতরা সেক্ষেত্রে হ্যালুসিনেসন, অর্থাৎ অদ্ভুত–অবাস্তব কিছু দেখে, কিংবা দেখে নেয়। মোদ্দাকথা, মস্তিষ্কের সবসময়ই ন্যূনতম কিছু উদ্দীপনা দরকার, যেক্ষেত্রে সংবেদনবঞ্চিতদেরকে হ্যালুসিনেসন, এবং ঘুমন্তদেরকে স্বপ্ন সেই উদ্দীপনা যোগায়।

স্বপ্নের প্রয়োজন কিংবা ভূমিকা সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা সর্বাধুনিক অন্য তথ্যের সমর্থনও পাচ্ছে। যেমন, জানা গেছে বহির্জগৎ থেকে আসা সংবেদন মেরুদণ্ডের শীর্ষাঞ্চলে অবস্থিত সূক্ষ্মজালতন্ত্রের (রেটিকুলার ফরমেশান) মাধ্যমেই গুরুমস্তিষ্কবল্কলে পৌঁছয়, কিন্তু ঘুমের সময় বাইরের সংবেদন পৌঁছয় না কিংবা কম পৌঁছয় বলে, সূক্ষ্মজালতন্ত্রও মস্তিষ্কবল্কলে খবর পাঠাতে পারে না, ফলে চিন্তা–ভাবনার জটিল ব্যবস্থাটি সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বপ্ন তখন ইতঃপূর্বে সঞ্চিত সংবেদন–স্মৃতি–অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করে এবং পাঠায়। এইভাবে মস্তিষ্কব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখে। "অন্যভাবে বলা যায় যে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে, কর্টেক্সের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার দরুন, মস্তিষ্কের নিচুর অংশ ও স্মৃতির (যা সেই দিনকার ঘটনা, ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অনুষঙ্গিত) আধার, —বিচ্ছিন্ন কোষগুলো, উদ্দীপ্ত হয়ে স্বপ্ন সৃষ্টি করে।" (*পাভলভ পরিচিত*) দীর্ঘক্ষণ ঘুম থেকে বঞ্চিত থাকার দরুনই নাকি গভীর রাতের স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার ফলে দীর্ঘস্থায়ী উদ্দীপনার দরকার মেটে। স্বপ্নউদ্দীপনা পায় বলেই স্বপ্ন দেখার সময়ে মানুষ নিশ্চল কাটায়, ঘর্ষণ- স্পর্শনের, এপাশ–ওপাশ করার প্রয়োজন হয় না। এই ধারার গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, বাইরের সংবেদন এবং স্বপ্নের সংবেদন—দুটোর কোনোটি না পেলে মানুষ স্বপ্নচক্রের প্রকৃতি, গড়ন ও রীতিতে 'হ্যালুসিনেশান' দেখে নেয়, ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে, মস্তিষ্কনির্ভর পরীক্ষার পাভলভীয় ধারা এবং যন্ত্রনির্ভর স্বপ্ন-গবেষণা কাছাকাছি এসে মিলেছে। যন্ত্রনির্ভর পরীক্ষায় মস্তিষ্কের আংশিক জাগরণ ও তৎপরতার যে তথ্য পাওয়া গেছে, পাভলভেরও সে-কথাই—স্বপ্ন অধিকাংশ নিস্তেজিত মস্তিষ্কের একাংশ উত্তেজনার ফল। "মস্তিষ্কের কিছু জায়গা ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে।.... এইসব কেন্দ্র ও কোষসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে স্বপ্নদৃশ্যের অভিনয় ঘটে।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০) বিচ্ছিন্ন সব মস্তিষ্কাংশের অনিয়মিত তৎপরতাই রয়েছে স্বপ্নের অলীকত্বেরও মূলে। তবে, এতটুকু বলাই যথেষ্ট কি না, এবং নিস্তেজনা-উত্তেজনার উপযুক্ত মিশ্রণের মাধ্যমে ক্লান্ত মস্তিষ্ককে রক্ষা করা কিংবা সংবেদন-সঞ্চারের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখা, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করার জন্যেই স্বপ্নের উদ্ভব, না কি স্বপ্ন মস্তিষ্কের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রক্রিয়ার পার্শ্ব ফলমাত্র, সেটা নির্ণয় করা সহ, স্বপ্নপ্রশ্নের আরো কিছু বিষয় বোধ করি এখনও বিতর্কিত রয়ে গেছে। 'কেন স্বপ্ন?"—এ প্রশ্নের উত্তরে স্বপ্ন-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটির স্বাভাবিক ফল হিসেবেই মস্তিষ্কের সুরক্ষা ঘটার কথা বলা চলে, বস্তুবাদী ব্যাখ্যায়ই বলা চলে স্বপ্নের সাথে বাস্তবের সংযোগের কথা। আকস্মিক যোগাযোগে স্বপ্নের মধ্যে সত্যের উপাদান অনিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকে, এবং সে-অর্থেই তাকে এক ধরনের মননক্রিয়া, সৃজনশীলতা, ইত্যাদিও বলা সঙ্গত, কিন্তু, তার অধিক নয়। কারণ, উদ্ভব-পরিকল্পনার দিক থেকে স্বপ্নের হয়তো কোনোই মহান উদ্দেশ্যে, ভূমিকা কিংবা নিয়মিত সারবস্তুও নেই।

দেখা গেছে যে, আর-ই-এম ৩ মিনিট থেকে ৫০ মিনিট পর্যন্তও স্থায়ী হয়। স্বপ্নের ব্যক্তিনির্ভর দৈর্ঘ্যের ওপর সেটা নির্ভর করে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে যে, সময়ভেদে একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিভেদে স্বপ্ন-বিবরণের তথা স্বপ্নের বিভিন্ন রকম দৈর্ঘ্য পাওয়া গেছে। গবেষণাগারে সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত স্বপ্ন-বিবরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবেই ছোট। ডিমেন্ট এবং ক্লাইটম্যান স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তিদের ৫ কিংবা ১৫ মিনিট পরে নির্বিচারে জাগিয়েছেন এবং ৮৩% ভাগ ক্ষেত্রে তারা তখনকার স্বপ্নটির সময়দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আর-ই-এম-এর দৈর্ঘ্য এবং

স্বপ্নবর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যার মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া গেছে। মুহূর্তের মধ্যে একটি গোটা স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে যায়—এই প্রাচীন জনপ্রিয় ধারণাটিও সঠিক নয়।

প্রত্যেকেই এক রাতে অন্তত একটি স্বপ্ন দেখে বলে জানা গেছে, যদিও এদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রথমে এও বলেছে যে, জীবনে তারা কখনোই স্বপ্ন দেখে নি। এও জানা গেছে, অভ্যস্ত-অনভ্যস্ত স্বপ্নদ্রষ্টা—সকলের ঘুমেই আর-ই-এম-এর সংখ্যা ও অংশ সমান, এবং স্বপ্নবিবরণ দিতে না পারাটা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য। সনবার, ল্যাকম্যান, ল্যাপকিন, হ্যাণ্ডেলম্যান এবং টার্ট, প্রমুখের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্বপ্নবিবরণে সক্ষম ব্যক্তিরা সাধারণত হন উদ্বেগপ্রকাশকারী তথা কল্পনাপ্রবণ স্বভাবের অধিকারী। এক্ষেত্রে অক্ষমগণ সাধারণত হন অবদমন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল, তথা অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী প্রকৃতির। এ্যান্ট্রোবোস (Antrobos *et al*, 1964) -এর সমীক্ষায় অবশ্য বলা হয়েছে যে স্বপ্নবিবরণ প্রদানে সক্ষম এবং অক্ষম-দু'ধরনের ব্যক্তিদের আর-ই-এম-এর সংখ্যা কম-বেশি না হলেও, সক্ষমদের আর-ই-এম-এর সময়দৈর্ঘ্য অধিক, অক্ষমদের আর-ই-এম-এর গতি বেশি, দৈর্ঘ্য কম।

স্বপ্নস্মরণ সম্পর্কে অবশ্য ক্লাইটম্যানরা একটু ভিন্ন কথা বলেছেন। তারা বলেছেন যে, গুরুমস্তিষ্কবল্কল আমাদের চিন্তা-ভাবনা-স্মৃতির আধার, স্বপ্নের সময় তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ফলে মানুষের পক্ষে স্বপ্নকাহিনী বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক। ভোরবেলার স্বপ্নের মাঝখানে এবং কখনো-কখনো মাঝরাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বপ্নের মাঝখানে ঘুম ভেঙে যায় বলেই এসব স্বপ্নের অংশবিশেষ নাকি মানুষের মনে থাকে। স্বপ্নস্মরণে অক্ষম ব্যক্তিদের ঘুম-ভাঙানো কঠিন, এবং অনেক ধাক্কাধাক্কির পর জেগে উঠে তারা আর স্বপ্নস্মরণ করতে পারে না বলেও বলেছেন গুডএনাফ এবং স্যাপিরো (Sapiro)।

ইইজি যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে স্বপ্নদ্রষ্টাদের প্রক্ষোভ বেড়ে যাওয়ার লক্ষণটি প্রথমেই জানা গিয়েছিল। পরবর্তীতে মনোরোগবিদ স্নাইডার স্বপ্নের এদিকটি নিয়ে অগ্রসর গবেষণা চালান। এবং দেখতে পান যে, রাতে প্রথম

স্বপ্ন থেকে তৃতীয় স্বপ্ন পর্যন্ত মানুষের এই প্রক্ষোভ বাড়ে। শেষরাত থেকে ভোরের দিকে আবার তা কমে আসে। প্রক্ষোভ তো নিম্ন বা জৈব মস্তিষ্কের ক্রিয়া। আর, মানুষ কখনো-কখনো এবং ঘুমের মধ্যেও, প্রক্ষোভ-তাড়িত হয়েই সময় কাটায়। এসময় গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ অনেকখানিই চলে যায়, এবং ঘুমের সময় জৈব মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে যা ঘটে, তা-ই স্বপ্ন, প্রক্ষোভপীড়িত বলেই তা যুক্তিহীন, প্রতীকধর্মী অনুভূতির সঞ্চারক। এ যেন প্রথম যুগের, নিচু স্তরের কলাকৌশলের নয় ইঞ্চি টেলিভিশন, ছবিগুলোর অর্থ অস্পষ্ট। অপরপক্ষে, গুরুমস্তিষ্কের তৎপরতার প্রতিফলন ঘটে এমন সব সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড বুঝি আধুনিক টেলিভিশনের স্পষ্ট পর্দা—ছবির লাইন, আলো-ছায়ার প্রতিটি দ্যোতনা—সবই বিশদভাবে চিত্রিত, ইত্যাদি। এখান থেকে আসা যাক, স্বপ্ন-স্মরণ সম্পর্কে স্লাইডার কি বলেছেন, সে প্রসঙ্গে। শারীরবৃত্তবিদ-মনোস্তত্ত্ববিদ কারো সাথেই মিললো না এই মনোরোগবিদের বক্তব্য, যেখানে তিনি বললেন যে, "যে স্বপ্ন কেবলমাত্র অনুভূতি জাগায়, যে সব স্বপ্ন প্রক্ষোভ-উদ্দীপক, সে স্বপ্ন স্বভাবত আন্ত্রিক মস্তিষ্কের ক্রিয়াফল, বাচনিক স্তরের প্রভাবরহিত"—অর্থাৎ লাল এদের কাছে রক্তের প্রতীক, ল; আ এবং ল অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত অর্থব্যঞ্জক কোনো শব্দ নয়। জাগ্রত অবস্থায় অর্থব্যঞ্জক ভাষার সাহায্য এদের স্মৃতিপথে আনা সম্ভব নয় (*পাভলভ পরিচিতি*, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ১০৪)। এ-ই নাকি স্বপ্ন ভুলে যাওয়ারও রহস্য। আর, যে সব স্বপ্ন মনে থাকে, সেগুলো হচ্ছে থটড্রিম বা চিন্তাস্বপ্ন, সেগুলো দেখার দায়িত্বও গুরুমস্তিষ্কের। প্রক্ষোভবর্জিত, অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ এইসব স্বপ্ন ভাষায় প্রকাশযোগ্য বলেই সংরক্ষিত এবং পরবর্তীতে বর্ণিতও হয়। স্বপ্নের এই দ্বি-জাতিতত্ত্বকে আর একটু সাজিয়ে নিয়ে স্লাইডার বললেন যে, "স্বপ্নবৃত্ত মনের বিভিন্ন স্তরকে আলোড়িত করে। তার ফলে কোনো স্বপ্ন মনে থাকে, কোনো স্বপ্ন থাকে না।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪) মনোমধ্যকার স্মৃতির স্তর সম্পর্কেও স্লাইডার বলেছেন।

যন্ত্রনির্ভর স্বপ্নসমীক্ষার আরো কিছু ফল এরূপ :

রোফওয়ার্গ (Roffwarg) প্রমুখ সমীক্ষক একমত যে, শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সবটা সময়ই মানুষের ঘুমে আর-ই-এম কিংবা স্বপ্ন থাকে।

সদ্যোজাত শিশুদের বেলায় স্বপ্নসময় ঘুমের ৫৫%–৮০%, সামান্য বড় শিশুদের বেলায় তা প্রায় ৪০%। ৩–৪ বছর বয়সে স্বপ্নসময়ের পরিমাণ অনেক কমে ২০% ভাগে চলে আসে, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রায় একইরূপ থাকে। মধ্যে এই পরিমাণ ৫৫% থেকে ৮০% ভাগ, কিশোরদের বেলায় ৫০% ভাগ। ৫০–৭০ বয়সের সময় স্বপ্ন সময় আবার কমে আসে। রাত বাড়ার অর্থাৎ ঘুম গভীর হওয়ার সাথে ক্রমান্বয়িকভাবে বর্দ্ধিত স্বপ্নসময়ের ব্যাপারটি ৩–৪ বছর থেকে শুরু হয়, বৃদ্ধ বয়সে চালু হয় এর উল্টো ধারা।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে জানা যায় যে, ঘুমের ৬$\frac{১}{২}$ কিংবা ৭$\frac{১}{৭}$ ঘণ্টায় আর–ই–এম ঘুমের সময়ে মানুষের নিজের থেকেই জেগে যাওয়ার হার কমবেশি ৪০% ভাগ। বিস্ময়কর যে, এই পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী রাতে স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে মানুষের জানানোর পরিমাণ প্রায় একই (৩৫% ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বলে যে, পূর্ববর্তী রাতে তারা স্বপ্ন দেখেছে)।

নিদ্রাকালের স্বপ্নচক্র কতোটা বিশ্বজনীন? জৌভেট (Jouvet, 1961) দেখেছেন, বিড়ালের বেলায় বিন্যাসটা অনেকটা মানুষের অনুরূপ। শুধু মন্থর নিদ্রাতরঙ্গ নয়, 'আপাতবিরোধী ঘুম' ও বিড়ালের রয়েছে — এ দুই–ই স্বপ্ন দেখার লক্ষণ। কর্টেক্স–সম্পর্কিত ইইজি পরিবর্তিত হয়ে যায় জাগরণ–ধরনের বিন্যাসে, অবস্থানরক্ষক পেশিগুলো যায় নরম হয়ে, আর দেখা দেয় ছোট ছোট আর–ই–এম। গোফ, চোয়াল এবং লেজের আক্ষেপও কখনো কখনো চোখে পড়ে। এই আপাতবিরোধী ঘুমপর্যায় ১০–১৫ মিনিট স্থায়ী হয়, এবং প্রতি ২০–৩০ মিনিট অন্তর দেখা দেয়। এরকমটা দেখেছেন ডিমেন্ট (১৯৫৮) এবং গ্রাস্টিয়ান (১৯৫৯)ও। তুলনীয় চক্র বানরের বেলায়ও দেখা গেছে, স্নাইডার তা দেখেছেন কুকুর এবং ভেড়ার ক্ষেত্রেও।

ভন (Vaughn)ও তাঁর পরীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, আর–ই–এম সময়ে অন্য প্রাণীরাও স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত বানরদেরকে পর্দার ওপর ছবি ভেসে ওঠা মাত্র একটি দণ্ডকে ধাক্কা দিয়ে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখানো হয়েছিল। পরবর্তীতে ঘুমের মধ্যে আর–ই–এম সময়েই বানরেরা দণ্ডটিকে

চাপ দিয়েছে, আর-ই-এম বহির্ভূত সময়ে নয়। তার পরিষ্কার অর্থ এটাই যে, আর-ই-এম সময়ের স্বপ্নদৃশ্যের প্রতি তারা সাড়া দিয়েছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে বানর, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, হাতি এবং এ্যাপ্রসামজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়াও কিছু কিছু পাখি এবং সরীসৃপের ক্ষেত্রেও স্বপ্ন দেখার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শুধু ঘুম কিংবা স্বপ্নের সময়কাল নয়, gamma-butyrolactone প্রয়োগ করে প্রাণীদের paracoxical sleep বাড়ানো যায়, ইম্প্রিনডোল বাড়ায় মানুষের স্বপ্নের পরিমাণ, ইত্যাদি। স্বপ্নের বিষয়বস্তু পর্যন্ত ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডি ক্যারল, এস লিউইস এবং আই অস্‌ওয়াল্ড (D. Carrol, S. Lewis and I. Oswald) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত তাঁদের সমীক্ষায় দেখেছেন যে বারবিচুরেট (barbituret) বড়ি স্বপ্নকে প্রশান্ত করে তোলে, স্বপ্নের হেলুসিনেসান প্রকৃতি কমায়, স্বপ্ন হয়ে পড়ে কিছুটা বিবর্ণ, চিন্তাগোছের। ভবিষ্যতে ঔষধ দু ধরনের ঘুমের (স্বপ্নঘুম এবং স্বপ্নহীন ঘুম) ওপরই মানুষের নিয়ন্ত্রণকে আরো বাড়াবে।

মস্তিষ্ক-কাঠামোর নির্বাচিত অংশকে ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসার মাধ্যমে ধ্বংস (surgical destruction)করে ফেলে দেখা গেছে যে, আর-ই-এম তথা স্বপ্ন নির্ভর করে পন্টাইন টেগমেন্টাম নামক মস্তিষ্ককাণ্ডের একটি এলাকার ওপর। নোরেপাইনেফ্রিন (norepinephrine) নামক একটি জৈবরসায়ন ভিত্তিক প্রক্রিয়ার সাথে স্বপ্ন জড়িত বলেও এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, সরোনটিন (sorontin) নামক আর একটি মস্তিষ্ক-রসায়নের সাথে জড়িত ঘুমের অন্যান্য অবস্থা। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদপিণ্ডের গতিতে পরিবর্তন, জিহ্বার গোড়ার নিকটবর্তী মাংসপেশিতে বিদ্যুৎ তরঙ্গের হ্রাসপ্রাপ্তি, পুংজননাঙ্গের উত্থান এবং স্ত্রী জননাঙ্গে বর্দ্ধিত রক্তপ্রবাহ, ইত্যাদি শারীরিক পরিবর্তনও স্বপ্নের সাথে সাথে ঘটে থাকে।

যন্ত্রনির্ভর স্বপ্নসমীক্ষা আমাদের প্রচলিত অনেক ধারণাকেও নস্যাৎ করে দিয়েছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা বলেছে যে, স্বপ্ন-আর-ই-এম, এর পরিমাপে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে স্বপ্নতুল্য বলে ব্যাপকভাবে বিবেচিত অনেক কিছুই, যেমন ঘুম শুরু এবং শেষ হওয়ার সময়কার

ভাবাবেশ (hypnagogic and hypnopompic reveries), দুঃস্বপ্ন, স্বপ্নদোষ (ঘুমের মধ্যে শুক্রনির্গমন) এবং স্বপ্নচারণ, ইত্যাদি কোনো কিছুই নাকি প্রকৃত স্বপ্ন নয়।

অলীক এবং নাটকীয় কোনো কিছু হিসেবে যদি স্বপ্নের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়, তাহলে তন্দ্রা-উত্থিত কিংবা ঘুমের শুরুতেই জেগে যাওয়া মানুষের বর্ণিত অভিজ্ঞতা ৭৫% ভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্ন বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্ন আর-ই-এম ঘুম থেকে এইসকল স্বপ্নিকা (dreamlets')-র নাকি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। "স্বপ্নিকা"দের আবেগ-উপাদান কম, এরা সুখকর নয়, দুঃখজনকও নয়। তাছাড়া, এরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী এবং কম বিস্তারিত হয়ে থাকে। বিমূর্ত চিন্তা কিংবা দিবা-অবশিষ্ট স্মৃতি (day residues)তেই এরা সাধারণত নির্মিত হয়। ঘুম শেষের "স্বপ্নিকা"দের নিয়ে অবশ্য পদ্ধতিগত সমীক্ষা খুব বেশি হয়নি, তবে তারা নাকি রাত্রের স্বপ্নের স্মৃতি কিংবা ক্ষণস্থায়ী আর-ই-এম ঘুমে ফিরে যাওয়ার আভাস।

দুঃস্বপ্নে মানুষ সাধারণত চিৎকার করে জেগে ওঠে। ঘুমন্ত শিশু জেগে উঠে বসে, ভয় পাওয়া চেহারা নিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকায়, কিংবা কুঁকড়ে যাওয়া শরীরে অনেকক্ষণ বসে থাকে। Night-terror (paver nocturnes) নামে পরিচিত এই ধরনের দুঃস্বপ্ন ২%–৩% ভাগ শিশুর মধ্যে দেখা যায়, চার থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে এরকম দুঃস্বপ্নের শতকরা ৫০% দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, ১০% ভাগ দেখা যায় বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে। অপর এক ধরনের দুঃস্বপ্নে মানুষকে অসহায় এবং শ্বাসরুদ্ধ বোধ করতে দেখা যায়, ভয়াবহ সব চিন্তা এসে ভিড় করে। Nightmares নামে কথিত এই দুঃস্বপ্ন শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, এদের বয়স সাধারণত আট থেকে দশ বছর হয়ে থাকে। ১৮১৭ সালেই নাকি দেখা গেছে যে গভীরভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন শিশুদের হঠাৎ জাগিয়ে, এবং ঘরে আগুন লাগার মতন মারাত্মক সব ঘটনার কথা শুনিয়ে প্রথম ধরনের দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব। পরবর্তীতে এটা দেখা গেছে যে স্বতঃস্ফূর্ত দুঃস্বপ্ন (নাইট টেরর এবং নাইটমেয়ার) গভীর ঘুম থেকে আকস্মিক জাগরণের সাথে জড়িত, যে-ঘুম পরীক্ষায় স্বপ্নহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি প্রমাণ হয়

যে, জাগরণের মুহূর্তের কোনো আবেগী সমস্যাই বিস্তারিত-বিবরিত ভয়ের সৃষ্টি করে।

স্বপ্নে হাঁটা কিংবা স্বপ্নচারণ এগারো থেকে চৌদ্দ বছরের ১% শিশুর ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। ঘুমন্ত ব্যক্তিরা বিছানা থেকে উঠে, চোখ মেলে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে, বাধা-বিপত্তি দেখে-দেখে নিরাপদে এগোয়, কিন্তু জেগে গেলে ঘটনাটি সম্পর্কে কিছুই আর বলতে পারে না। ইইজি পাঠ থেকে বোঝা যায় স্বপ্নহীন ঘুমের সময়ই মানুষ হেঁটে বেড়ায়, আর-ই-এম ঘুমের সাথে এই আচরণের সম্পর্ক এখনো উদ্ঘাটিত হয় নি।

তথাপি স্বপ্ন

We dream, and dreaming make
The solid earth to shake:
We build a dome, the mirror of our mind,
Whose light doth make us blind
To earth when we awake.

বলা হয়েছে যে, আণবিক মিশাইলকে যদি কেউ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ মনে করে, তবে সে একটি স্বপ্ন–আচরণই করবে। কিরূপ স্বপ্ন-আচরণ? এ্যালার্ম ঘড়ির ঘন্টা বাজলে অনেক সময় যেমন তার সংকেতকে স্বপ্নান্তর্গত কোনো শব্দ মনে করে নিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তি তার ঘুম চালিয়ে যায়, ঘুমকে রক্ষা করে, তদ্রূপ স্বপ্নআচরণ। এক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন এবং জাগ্রত ব্যক্তির ভাবনা দুই-ই বাস্তবকে অস্বীকার করার দৃষ্টান্ত। আর, বাস্তবকে অস্বীকার করে এমন সকল কিছু—স্বপ্ন, ভাবনা, কাজ—সবই যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সে তো বলাই বাহুল্য। স্বপ্নে হোক, জাগরণে হোক, বিপদ তথা বাস্তবকে অস্বীকার করার ফলে ঘুমের স্থিতিশীলতাই রক্ষা হয়, প্রকৃত জাগরণে পূর্ণ হতো এমন মূল্যবান ইচ্ছে হয় অবদমিত।

মুক্তিলাভের প্রাক্কালে আন্তিগনে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছে ও প্রয়োজন তথা বাস্তবকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই (আন্তিগনের অনুরূপ) আত্মবিনাশী স্বপ্ন–আচরণের পরিণতিকেও এড়ানো সম্ভব। কারণ, আন্তিগনেকে জীবিত সমাধি লাভ করতে হয়েছিল বাঁচার ইচ্ছেকে অবদমিত করার জন্যে নয়, থিবির ক্ষমতাবান রাজাকে অমান্য

করার জন্যেই। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে পায়ের ওপর দাঁড় করালেই পাওয়া যাবে (ক্ষমতাধরদের হাতে) মৌল ইচ্ছেসমূহের বাস্তব দমনের ব্যাপারকে। এবং স্বপ্নের মোহমুক্তি ঘটবে তখনই, যখন আমরা ইচ্ছে–অবদমনের রহস্য আর সেই অদ্ভুত ইচ্ছেগুলোর মধ্যে খুঁজবো না, খুঁজবো তাকে দমনকারী শক্তি ও বাস্তব পরিস্থিতির চত্বরে। এবং স্বপ্নের সেই মোহমুক্তির স্বপ্ন আমরা দেখেই চলবো। ঐশী, অলৌকিক কিংবা ইচ্ছেপূরণের মতো কোনো ভূমিকা স্বপ্নকে আমরা কখনো মঞ্জুর করবো না, বাস্তবকে অস্বীকার করার স্বপ্নও আমরা দেখবো না, তথাপি স্বপ্ন আমরা দেখবো, প্রাণভরে দেখবো বাস্তবকে স্বীকার করার এবং পাল্টানোর স্বপ্ন।

বাস্তব এবং স্বপ্নের সম্পর্ক বিষয়ে বলেছিলেন কিয়েৰ্কেগার্দও।

কিয়েৰ্কেগার্দ বলেছিলেন, স্বপ্ন অতীত আদান–প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটায়, বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে, ভবিষ্যতের জন্যে নতুন গতিমুখ তৈরি করে। স্বপ্নে বুদ্ধিবৃত্তি তার নিজস্ব বাস্তবকে পরিকল্পনা করে ("In dream, the intellect plans its own reality.")। নিদ্রান্তর্গত স্বপ্ন সম্পর্কে এই মূল্যায়ন সত্য না হলেও মানুষের জন্যে অন্য অনেক স্বপ্নের ভবিষ্যৎমুখী তথা আশাআকাঙ্খাধর্মী বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। কিয়েৰ্কেগার্দীয় বাস্তব ভিত্তি থাকলে, তেমন স্বপ্ন বুঝি খুব বেশিই দরকার।

স্বপ্নের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনও। পিসারেভ বলেছিলেন, "স্বপ্ন এবং জীবনের মধ্যে যদি সংযোগ থাকে তাহলে সবই ঠিক আছে।" পিসারেভ বিস্তারিত বলেছিলেন, "মানুষ যদি....স্বপ্নদেখার সকল ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, যদি সে সময় থেকে সময়ান্তরে এগিয়ে যেতে এবং যা সে মাত্র তৈরি করতে শুরু করেছে তাকে একটি সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ ছবিতে মানসিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারে, তাহলে আমি মোটেই বুঝতে পারি না, শিল্প–বিজ্ঞান এবং বাস্তব প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং কষ্টসাধ্য কাজ হাতে নিতে এবং সম্পূর্ণ করতে মানুষ কি করে উদ্বুদ্ধ হবে। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যকার ব্যবধান কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা

ব্যক্তি তার স্বপ্নে ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে, যদি সে জীবনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, পর্যবেক্ষণসমূহকে তাঁর আকাশকুসুমসমূহের সাথে তুলনা করে এবং, সাধারণভাবে বললে, যদি সে তার অদ্ভুত কল্পনাসমূহ (fantasies) অর্জনের জন্যে বিবেকবানভাবে কাজ করে।" পিসারেভের এমন স্বপ্নভাবনার প্রেক্ষিতেই লেনিন বলেছিলেন : "দুখজনকভাবে আমাদের আন্দোলনে এই ধরনের স্বপ্ন দেখার ব্যাপার খুব কমই রয়েছে।" লেনিন বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সমাজবিকাশের নিয়মগুলোর পর্যাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে "দরকারি স্বপ্নদেখার" জরুরি প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাজনীতির সংগ্রামেও বিপ্লবী স্বপ্ন মানুষকে ফিলিস্টিনিজমের বাইরে নিয়ে আসে, তাকে ভবিষ্যতের ছবি দেখায়, শক্তি ও সাহস যোগায়। নির্মম বাস্তব কিংবা বস্তুবাদী তত্ত্বও স্বপ্নবিরোধী কিছু নয় ; লেনিন বলেছিলেন, শিল্পবিজ্ঞানসহ সকল কর্মক্ষেত্রেই স্বপ্ন চাই, বস্তুবাদী তত্ত্বও সৃজনশীল কল্পনার সাহায্য নিয়েই এগোতে পারে। লেনিন এও বলেছিলেন, "যদি কোনো মানুষের লালন করার মতো কোনো স্বপ্ন না থাকে, তবে সে পশুতে পরিণত হয়," (ভি, আই, আনুখিনের স্মৃতিচারণ)।

দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-বঞ্চনার মধ্যে আবাল্য বর্ধিত নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউজেস, তিনিও আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

Hold fast to dreams,
For, if dreams die,
Life is a broken-winged bird
That cannot fly. (Dreams)

কঠিন-কঠোর বাস্তব যে স্বপ্নকে কেড়ে নেবে, তা নয়, স্বপ্নহীনতাই বরং আনবে ধূসরতর বাস্তবকে, গতিহীনতাকে, মৃত্যুকে। অন্যথায়, অতিবঙ্কুর পথে চলমান যে জীবন, বন্দী জীবন, সেখানেও থাকে অগ্রযাত্রার স্বপ্ন, মুক্তির স্বপ্ন। স্বপ্ন সেখানে আরো জরুরি প্রয়োজন, তখন যেন 'স্বপ্নের দিন গোনা।' স্বপ্ন যে শুধু পলায়ন নয়, নয় অবাস্তব আচরণ, সে কথা বলতে-বলতে বিষ্ণু দেও মুক্তির প্রসঙ্গেই যান :

কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু বাবু পলায়ন?
স্বপ্নকে কেন এ ভ্রান্ত ভয়?
স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা,
চাও, চাও আরো স্বপ্ন, থরোথরো অন্ধকার,
কিবা ঘুম কিবা জাগা, সদা স্বপ্নময়
বর্তমান অন্ধকারে রাঙাও শূন্যতা চন্দ্রিম আভায়,
চাও বীজকম্প্র ভবিষ্যতে, বাস্তবতা, স্বপ্নে যা তন্ময়,
ভয় কেন? স্বপ্নেই মুক্তির জাগা, নবজন্ম।

(কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু
পলায়ন।)

গ্রন্থপঞ্জি

১. *ড্রিম্‌স্‌ এ্যাণ্ড নাইটমেয়ারস্‌*—পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৫৪

২. *দ' প্যান বুক ড্রিম্‌স্‌*—মরিয়েল গ্রে, লণ্ডন, ১৯৬৪

৩. *দ' সায়েন্স অব ড্রিম্‌স্‌*—এডুইন ডায়মণ্ড, লন্ডন, ১৯৬২

৪. *দ' ইন্টারপ্রিটেশান অব ড্রিম্‌স্‌*—সিগমাণ্ড ফ্রয়েড

৫. *এ্যান আউটলাইন অব সাইকোএ্যানালিসিস*—সিগমাণ্ড ফ্রয়েড—নর্টন, নিউইয়র্ক, ১৯৪৯

৬. *বিয়ণ্ড দ' প্লেজার প্রিন্সিপল*—সিগমাণ্ড ফ্রয়েড, লিভারহাইট, ১৯৫০

৭. *মেমোরিজ, ড্রিমস, রিফ্লেক্সশানস্‌*—সি, জে, ইয়ুং, র‍্যান্ডম হাউজ, লন্ডন-গ্লাসগো

৮. *স্বপ্ন*—শ্রী গিরীন্দ্র শেখর বসু, কলকাতা

৯. *লেকচারস্‌ অন কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্সেস্‌*—আই পি পাভলভ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক

১০. *এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি এ্যান্ড আদার এসেজ*—আই পি পাভলভ, ফিলোসফিক্যাল লাইব্রেরী, নিউইয়র্ক, ১৯৫৭

১১. *কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্সেস এ্যান্ড সাইকিয়াট্রি*—আই পি পাভলভ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক

১২. *পাভলভ এ্যান্ড ফ্রয়েড*—হ্যারী কে ওয়েলস, লরেন্স এ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন, ১৯৬০

১৩. *পাভলভ পরিচিতি*—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—নাভানা, কলকাতা

১৪. *ফ্রয়েড প্রসঙ্গে*—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঈগল পাবলিশিং কোং, ১৯৫২, কলকাতা

১৫. *এনচ্যান্টেড ল্যান্ডস্কেপ*, আহসানুল হক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়লয়, ঢাকা

১৬. *স্লীপ, ড্রিম্‌স্ এ্যান্ড এ্যারাউজাল*—এডওয়ার্ড জে মুরে, মেরিডিথ পাবলিশিং কোং, নিউইয়র্ক

১৭. *দ' শেপ অব মাইন্ডস্ টু কাম*— জন জি. টেলর, পেঙ্গুইন বুকস ইনক, বাল্টিমোর, ম্যারিল্যান্ড

১৮. *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টো-ডিসে, ১৯৯৪।

এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে।

সবাই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কেন? স্বপ্ন সভ্যতাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে? স্বপ্ন কি সত্যি? স্বপ্ন কি মিথ্যা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এ বই।